বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভুস্বর্গের পথে

স্বাক্ষর প্রকাশনী
৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশ করেছেন : অজিত মিত্র
৬০, সত্যেন রায় রোড
বেহালা, কলিকাতা-চৌত্রিশ

প্রথম সংস্করণ : ১লা শ্রাবণ '৬০

প্রচ্ছদ কল্পনায় : শ্রীগোপাল বিশ্বাস
ব্লক নির্মাণে : ব্লক সেণ্টার, কলি-নয়
ব্লক মুদ্রণে : শ্রীগোবিন্দ প্রেস, কলি-নয়

গ্রন্থ মুদ্রণে : শরৎচন্দ্র গুড়ে
২৬সি, কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা-নয়

ভূস্বর্গের পথে ভূস্বর্গের পথে ভূস্বর্গের পথে ভূস্বর্গের পথে ভূস্বর্গের পথে ভূস্ব

ভূস্বর্গের পথে

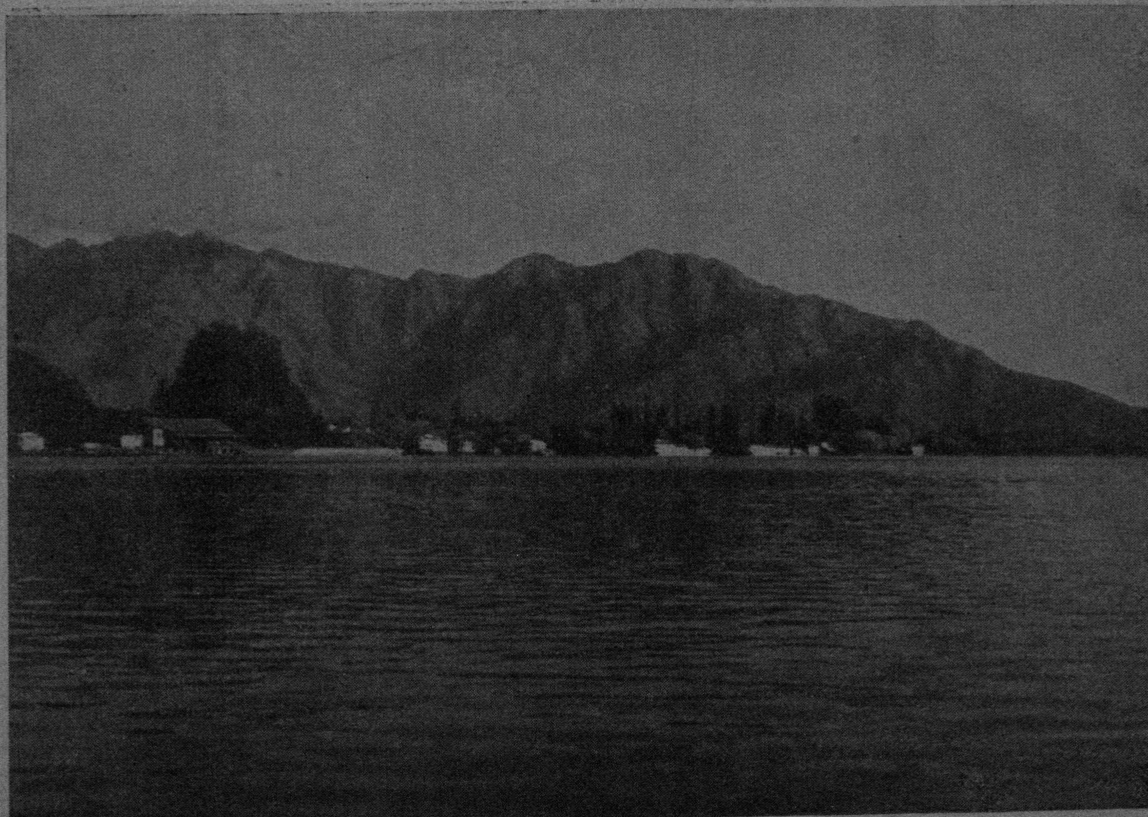
পথে ভূস্বর্গের পথে ভূস্বর্গের পথে ভূস্বর্গের পথে ভূস্বর্গের পথে ভূস্বর্গের পথে

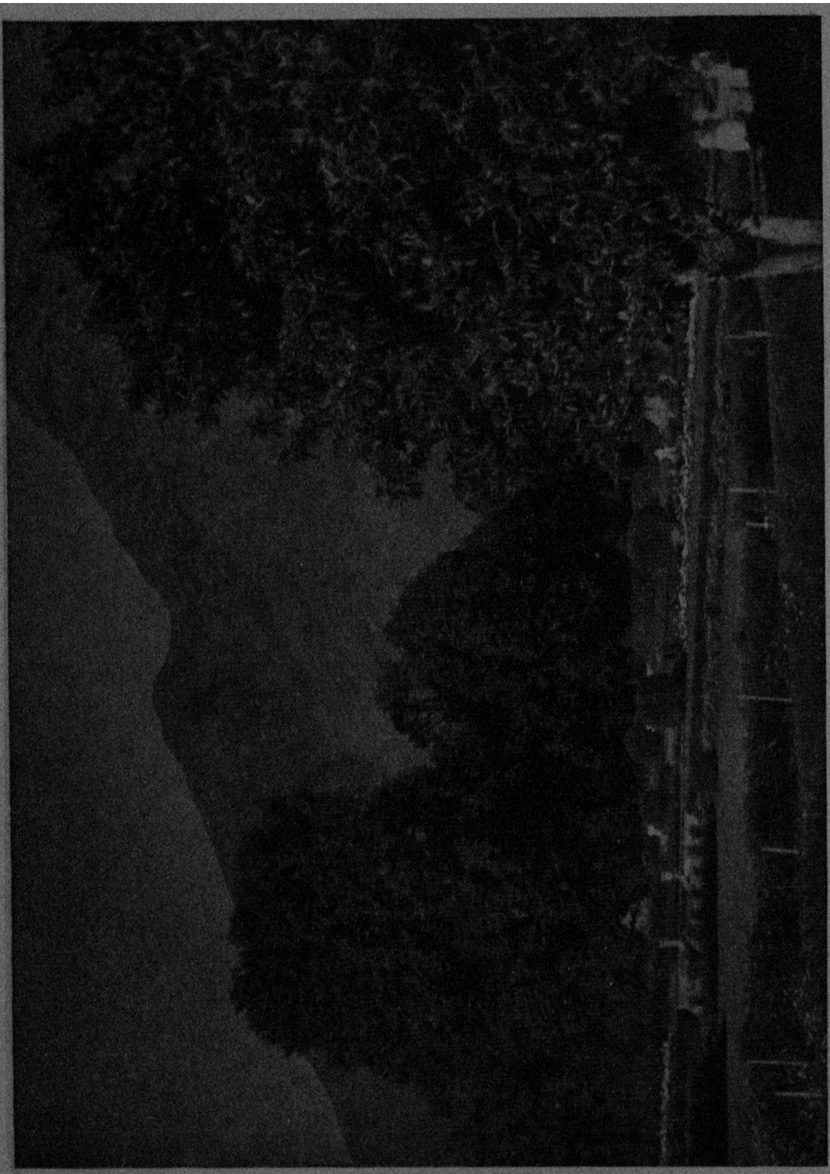
উৎসর্গ-পত্র

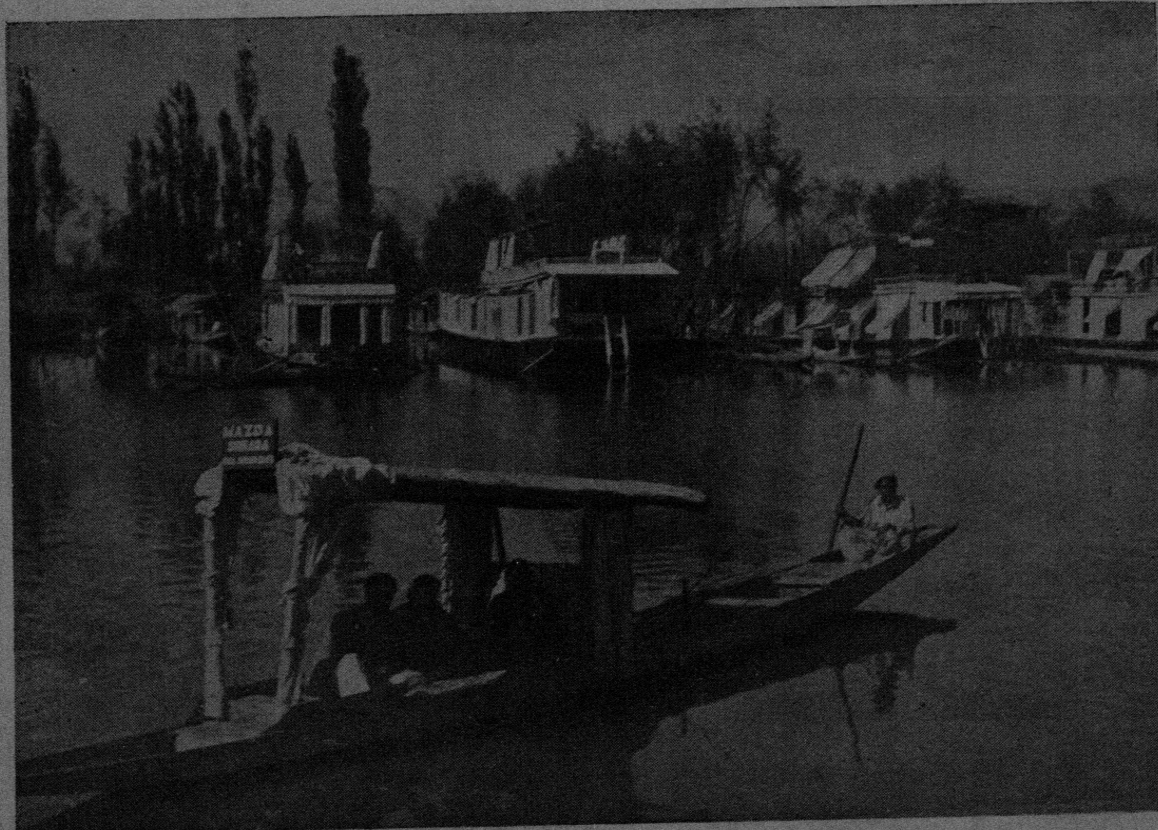
আমার আত্মীয়-স্বজন,
বন্ধু-বান্ধব আর কাশ্মীরে
পরিচিত সঙ্গী-সাথীদের
হাতে এ গ্রন্থ তুলে দিলাম।

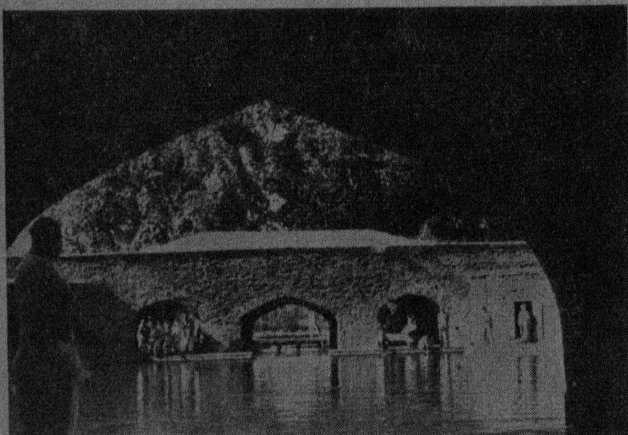
বি. কু. ব.

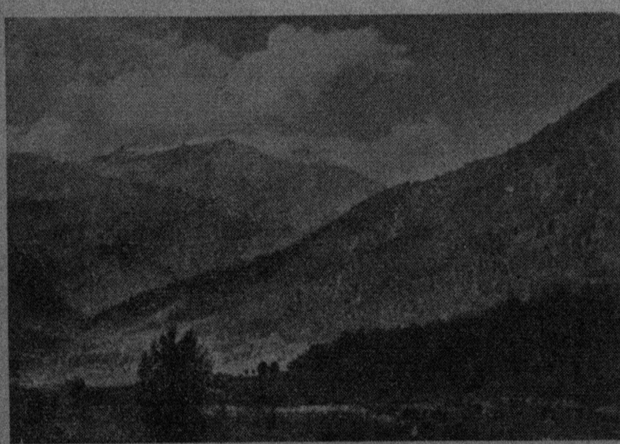
১০, আলিপুর পার্ক রোড
কলিকাতা-২৭






MAZDA





প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতি বছর পূজার ছুটিতে বেড়াতে যাই।

বায়ু পরিবর্তনের জন্য নয়। কোন একস্থানে বসে থাকা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। তাই লম্বা ছুটি পেলে দেশান্তরে পাড়ি দিই।

এবার বাইরে কোথাও যাব না স্থির ছিল। দুর্গম তীর্থস্থান ও কয়েকটি শৈলনিবাস ছাড়া প্রায় সবই ত দেখা। অদেখার মধ্যে ভূস্বর্গ কাশ্মীর এখনো বাকি আছে, কিন্তু সে ত এখন বন্যায় ভাসছে।

এদিকে দেশের আবহাওয়া দিন দিন যেন ঘোরাল হ'য়ে আসছে। পঞ্চশীলায় ফাটল ধরিয়ে চীন আজ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল গ্রাস ক'রে রয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ এবার প্লাবনের মুখে প'ড়ে 'ত্রাহি মধুসূদন' রব তুলেছে।

এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে বাংলার চিরবিদ্রোহী ছাত্রদল নব প্রেরণায় উৎসাহিত ক'রল দেশকে মাতৃপূজার শুভ আহ্বান জানিয়ে। রাস্তার অলিগলি ভরিয়ে দিল সার্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রাচীরপত্রে।

আনন্দে চঞ্চল মন সানাই-এর সুরে উদাস হ'য়ে দূরদূরান্তরের পথে চলে যেতে চায়। সে ভাব ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যেন কোন অদৃশ্য শক্তি অজানার পথে আকর্ষণ করে নিয়ত।

শেষে কাশ্মীর যাব স্থির ক'রে 'বার্থ' রিজার্ভ ক'রে বসলাম।

'৫৯ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর মালপত্র অমৃতসর মেলে উঠিয়ে প্লাটফর্মে নেমে দেখি অফিস ফেরত তপেন বোস দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি তপেন বাড়ি যাবে না?" ঠোঁটে হাসি চেপে তপেন বলল, "বাড়িই ত চলেছি, এত বৃষ্টিতে আপনি আসতে পারলেন কিনা তাই দেখতে এলাম।"

পরক্ষণেই ভগ্নিপতি ছবি ও বোন রমা এসে দাঁড়াল হাসিমুখে। ছবি বলল, "কি দুর্যোগ, বেরুতে আর পারি নে।" রমা যোগ করল, "মনে হ'ল যাবার সময় বুঝি আর আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল না।"

সন্ধ্যা সাতটায় গার্ডের বাঁশীর সঙ্গে ট্রেন ছেড়ে দিল। রমা ও ছবি রুমাল নাড়াতে সুরু করল। তপেনও বাদ গেল না। ওদের দেখে আমিও রুমাল নাড়ালাম। মুহূর্তের মধ্যে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে তার গন্তব্যপথে এগিয়ে চলল।

পরদিন ট্রেনে আশুবাবুর সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেল। ক'লকাতায় বাড়ি, ধনী ব্যবসায়ী। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কাশ্মীর চলেছেন। আমি কাশ্মীর যাব শুনে খুশী হ'য়ে বললেন, "এতক্ষণে কথা বলবার তবু একজন সঙ্গী পেলাম। এতদূর পথ চুপচাপ মুখ বুজে কি থাওয়া যায়, আপনিই বলুন না?" কথাটা বলে ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, "প্রথমটা একটু অসুবিধা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত সঙ্গী জুটে যায়।" তিনি বললেন, "আপনার বেড়ান অভ্যাস আছে, তাই অভিজ্ঞতা প্রচুর। আমার কিন্তু বাড়ি ছাড়া এই প্রথম।"

"এর পূর্বে আপনি কি কোথাও যাননি?"

"নড়বার ফুরসুৎ নেই মশায়, অথচ জানেন, আমার ভাইরা দু'দুবার কাশ্মীর ঘুরে গেছেন?"

"আপনি বোধহয় বাড়ির কর্তা? সেজন্যে নানান অসুবিধা—"

"আর বলেন কেন? কতদিনের সাধ কাশ্মীর দেখবার—কিন্তু

উপায় কি ? ব্যবসা বাণিজ্য ভাসিয়ে দিয়ে ত সখ করতে পারি নে। দায়িত্ব যখন কাঁধে আছে, বোঝা বইতেই হবে। তবে শেষ পর্যন্ত জানেন, ভাইদের কল্যাণই হ'ল।"

"ভাইরা বুঝি সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছু'টি বার্থ রিজার্ভ ক'রে আমাকে সংবাদ দিলেন।"

"ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য।"

"প্রথমে ছু'খানা টিকিট দেখে একটু বিরক্ত হয়েছিলাম। ভাই সেটা বুঝতে পেরে বললেন অত দূরের পথ, দাদা একলা যাওয়া ঠিক নয়, সঙ্গে চণ্ডী যাক। কথাটি শুনে চুপ করে গেলাম। নচেৎ ভাই মনে করবেন---দাদা সব সময়েই খিট্‌খিট্ করেন।"

আমি হাসলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি একা এসেছেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বন্ধুরা গত বছর কাশ্মীর ঘুরে গেছেন।"

তিনি 'চণ্ডী ও চণ্ডী' বলে ডাকতে একটি সুশ্রী যুবক কাছে এসে দাঁড়াল।

ইঙ্গিতে আমাকে দেখিয়ে আশুবাবু বললেন, "মিঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে পরিচয় করে নে, উনিও আমাদের মত কাশ্মীর চলেছেন।"

যুবককে প্রতিনমস্কার করে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সঙ্গে ক্যামেরা এনেছেন তো ?"

আশুবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "আপনিও যেমন - ওকে আবার 'আপনি' বলা ? 'তুমি' বললেই যথেষ্ট হবে। ওর কাকা আসবার সময় তার ক্যামেরাটি সঙ্গে দিয়েছে।" আমি চণ্ডীবাবুকে প্রশ্ন করলাম, "ক্যামেরার মেকার কি ? লেন্স কত ?" আশুবাবু বললেন, "ও ওসব কিছু বোঝে না মশায়। ওর কাকা সব কিছু কিনে ওর মধ্যে ভরে দিয়েছে। আপনি যখন সবই জানেন, খুশিমত ছবি উঠিয়ে নেবেন।" তি

আমি বললাম, "বহুদিনের অনভ্যাস, এখন সব নষ্ট হয়ে গেছে।"

"যতই অনভ্যাস থাকুক মশায়—জানেন তো পুরোন চাল ভাতে বাড়ে?" কথাটি বলে ভদ্রলোক হো হো করে হাসলেন।

সন্ধ্যার পর আশুবাবু স্নানঘরে ঢুকলে চণ্ডী এসে জিজ্ঞাসা করল, "মিঃ চ্যাটার্জী কি খুব ব্যস্ত আছেন?" আমি তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললাম, "না, কিছু বলবেন?"—"না, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় অন্ততঃ 'আপনি' 'আজ্ঞা' এগুলি সব বাদ দেবেন। নচেৎ বাবার কানে একবার গেলে তিনি আমার মুণ্ডপাত করবেন।" মৃদু হেসে বললাম, "তোমার বাবাকে বুঝি তুমি খুব ভয় কর?"—"ঠিক ভয় নয়, তবে অনর্থক বকুনিগুলি খেতে কার ভাল লাগে বলুন?"

খুশী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "বল কি বলতে এসেছ?" একটু ইতস্ততঃ করে সে বলল, "আপনি খাতায় কি সব লিখছিলেন, একটু দেখাবেন?" "ও এমন কিছু নয়, কোথায় কি দেখলাম একটু টুকে রাখছি।" কুণ্ঠিত হয়ে সে বলল, "আমারও লেখার অভ্যাস আছে কিনা তাই—তবে গল্প নয়, কবিতা।"

একমুখ হাসি নিয়ে বললাম, "তুমি তাহলে কবি বল?"—"তা যা বলেন আপনি। শুনবেন আমার কবিতা?"—"এখন নয়, কাশ্মীরে গিয়ে নূতন কবিতা লিখে আমাকে শুনিও।" "এখন তো একটা শুনুন" বলে চণ্ডী সুরু করল—

"একখানি হাসি মুখ বড় একেলা,
চারিদিকে বাঁকা চোখ করিছে খেলা।
ইসারায় নানা কথা অনেকেই কহে,
না বোঝার ভান করে নীরবে সে সহে।
একদিন নিরিবিলি নিকটে আসিয়া—
ভাবনা কি বলিয়া সে শুধাল হাসিয়া।

নীরোগ হোয়েছো, শুধুই দুর্বলতা,
আছে যতটুকু তা সেরে যাবার কথা—
অচিরেই মাত্র কয়েক দিন পরে,
ছাড়া পেয়ে চলে যাবে আপনার ঘরে।
হাত ধরে বলি তারে, নহে সে কারণ
তোমারে ছাড়িতে মন করে যে বারণ।
তির্যক ভঙ্গিতে বলে 'একি কথা ভাই ?
ছোট বোন নার্সকে একথা বলিতে নাই।"

স্নান ঘরের দরজা খোলার শব্দ শুনেই চণ্ডী তার জায়গায় চলে গেল।

জলন্ধরে ট্রেন বদল করে ২৮শে সেপ্টেম্বর দুপুরে আমরা পাঠানকোট পৌঁছলাম। ১১৬০ মাইল রাস্তা আসতে সময় নিল ৪৩ ঘণ্টা। ষ্টেশনের পাশেই হোটেল। আশুবাবুকে বললাম "চলুন স্নানটা সেরে আসি।"—"আপনি যান মশায়, আমি ততক্ষণে বাসের খোঁজ খবর জেনে আসি।"—"সেই ভাল, আমি যত শীঘ্র পারি আসছি।" মিনিট পনের পরে ফিরে দেখি আমার বিছানা ও স্যুটকেশ যথাস্থানে কিন্তু আশুবাবু বা চণ্ডীর আর দর্শন পাওয়া গেল না।

ম্যানেজারকে আমার জন্য নিরামিষ খাদ্য পাঠাতে বলে ঘরে এলাম। উর্দিপরা ভৃত্য ভাতের প্লেট এনে টেবিলে রাখল। পাশের টেবিলে এক দম্পতি আহার করছেন। পেঁয়াজের চাটনি দেখে পাত্রটা ফেরৎ দিলাম। কলাই-এর ডাল মেখে আলুবিহীন ভিণ্ডি-চচ্চড়ি দিয়ে একগ্রাস ভাত মুখে তুলেই উঠে পড়লাম।

ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর কানে এল, "দেখ ভদ্রলোকের খাওয়া হল না।" ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "উঠে পড়লেন যে ?"

—"কি করি ? এটাও পেঁয়াজে ভর্তি।" আলু ও মটরের তরকারী আমি তাঁকে দেখিয়ে দিলাম। —"আপনি বুঝি পেঁয়াজ খান না ?" —"আজ্ঞে না, একেবারেই নয়।"

কুণ্ঠিত হয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, "চাটনি ফেরৎ দেওয়া দেখেই বুঝতে পেরেছি। এখন কি করবেন?" ম্লান হেসে বললাম, "করবার কি আছে? ভগবান আজও অন্ন মাপান নি।"

"একটু বসুন, আমাদের কাছে খাবার আছে, এনে দিচ্ছি।" "—না না আপনি অযথা ব্যস্ত হবেন না।" —"আমি না ফেরা পর্যন্ত তুমি ভদ্রলোককে যেতে দিও না।" ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে কথাকয়টি বলে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

মিনিট তিনেক মধ্যে ভদ্রমহিলা প্লেটে চারটে কড়া পাকের সন্দেশ আর একগ্লাস জল এনে টেবিলে রাখলেন। তারপর আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে বললেন, "দেখেই চিনেছি বাঙ্গালী ও কলকাতা থেকে আসছেন। চোখের সামনে আপনাকে অভুক্ত দেখে যদি অপরিচিত বলে পাস কাটাই, তাহলে ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন না। আমারও আত্মীয়স্বজন আছেন, তাঁরা এই রকম অবস্থায় পড়লে অপরেও তো অনাত্মীয় বলে পাস কাটাবেন।"

আমি কোন কথার জবাব দিলাম না। ভদ্রমহিলা বলে চললেন, "স্ত্রীলোক না হলে তার মর্মবেদনা উপলব্ধি করা যায় না।"

ভদ্রমহিলা চুপ করতেই ভদ্রলোক সুরু করলেন, "দাদা ভাল করে হাতমুখ ধুয়ে সামান্য একটু জলযোগ করুন, তা নইলে উনি বড় আঘাত পাবেন।"

খাবার খেয়ে পুরো একটি গেলাস জল খেলাম। তারপর ওঁদের দিকে ফিরে বললাম, "সুন্দর খাবার, সবই খেয়ে ফেললাম। এখন মনে হচ্চে সত্যই ক্ষিদে পেয়েছিল।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "ক্ষিদের আর অপরাধ কি? পুরো দুটো দিন আর দু'রাত তো ট্রেনে কেটেছে। আজ পেটে দুমুঠো ভাত পড়লেই ভাল হ'ত।"

কথাটি বলে ভদ্রমহিলা আমাকে প্রণাম করলেন। তারপর মুখ

তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আমাকে ছোটবোন মনে ক'রে নাম ধরে ডাকবেন। আমার নাম স্বপ্না।"

পরক্ষণেই একটা ঢোক গিলে চাবির গোছাটা হাতে নিয়ে, "ইনি আমার স্বামী" সলাজ ভঙ্গিমায় কথা ক'টি বলে মুখ নিচু করলেন। ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল।

আমি তরুণীর সপ্রতিভ ব্যবহারে খুশি হ'লাম। বললাম, "যাত্রা আমার শুভ। কেমন সুন্দর একটি বোন পেয়ে গেলাম!"

"আর ভাইটি বুঝি ফেলনা?" কথাটি বলে যুবক আমাকে প্রণাম করলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, "দাদা অধমের নাম ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। আপনি আমাকে ডাকনাম রূপেন বলে ডাকবেন ও তুমি বলবেন।"

একমুখ হাসি ছড়িয়ে বললাম, "চমৎকার! ভাইটি আমার উপরি পাওনা। এক বৃন্তে দুটি ফুল। একটি বোন ও একটি ভাই আমার লাভ হ'ল। পাঠানকোট আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে রইল।"

স্বপ্না বলল, "তা যদি বলেন দাদা, আমরাই হলাম বেশি লাভবান। মনের মতন সঙ্গী পাওয়া ভাগ্যের কথা, বিশেষ করে এই বিদেশে।"

নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, "আমার নাম প্রণব চট্টোপাধ্যায়, থাকি আলিপুরে।" স্বপ্না হাসিমুখে আমার সুটকেসের উপর আঁটা লেবেল প্রসঙ্গ তুলে বলল, "জানি আমরা, আগেই দেখেছি।"

হোটেল থেকে বাইরে আসবার সময় হলে কয়েকজন বাঙ্গালী মহিলা ভাতের থালার সামনে হাত তুলে বসে আছেন দেখলাম। স্বপ্না বলল, "এঁদের অবস্থা মনে হয় দাদার মত হয়েছে।" রূপেন জবাব দিল, "বাংলার বাইরে পেঁয়াজকে আমিষের পর্যায়ে ধরে না। এটা অনেকেরই জানা নেই।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হোটেলের সামনেই কয়েকটি কাশ্মীর যাবার বাস দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁকা দেখে আমরা একটাতে উঠলাম। স্বপ্না বলল, "দাদা সামনে যাচ্ছেন কেন? পিছন তো একেবারে খালি।"

রূপেন জানিয়ে দিল, "পাহাড়ি পথে মাঝখানে সবাই ভাল। তাতে ঝাকুনি কম লাগে।" "ওমা তাই নাকি? হ্যাঁ দাদা, কথাটি সত্যি?" "হ্যা" বলে আমি রূপেনকে সমর্থন করলাম। স্বপ্না বলল, "বাসগুলি নীচু হলেও বসবার জায়গাগুলি কিন্তু ভারি সুন্দর।"

রূপেন জবাব দিল, "বিশেষ ক'রে হেলান দিয়ে মাথা রাখবার।"

স্বপ্না প্রশ্ন করল, "দাদা এখান থেকে শ্রীনগর কতদূর?" "২৬৭ মাইল।" "আর জম্মু?" "মাত্র ৫৭ মাইল।"

আমাদের বাসের চারদিকে ফেরিওয়ালারা নানান জিনিস নিয়ে হেঁকে চলেছে। স্বপ্না এক আপেলওয়ালাকে ডেকে তিনটি আপেল বেছে পাল্লায় চাপাল। ওজন হল এক সের। জিজ্ঞাসা করল, "কেত্‌না দেনে হোগা জী?" "এক রূপেয়া মেম্‌সাব।" ব্যাগ খুলে স্বপ্না একটা টাকা দিল।

তারপর আমাকে বলল"দেখুন দাদা আপেলগুলো কত বড় ও কি সস্তা!" পরক্ষণেই রূপেনকে বলল, "দেখ দেখ দাদার কি ছেলে মানুষি, লজেন্স কিনছেন একরাশ!" রূপেন হেসে বলল, "ভালই

তো, দাদা যা কিনবেন ভাই-বোন তাতে ভাগ বসাবে।" "তুমি 'ল' পড়লে উন্নতি করতে।" "বহু লেটে কথাটা আবিষ্কার করেছ, এখন আর উপায় নেই।" "আহা আমি বুঝি তাই বলছি ?"

আমি ওদের ছেলেমানুষি দেখে হাসতে লাগলাম।

পর পর পাঁচখানি বাস গতি নিয়ে মসৃণ পীচের রাস্তায় উল্কা বেগে ছুটল। সামনের সীটে পাশাপাশি রূপেন ও স্বপ্না। তাদের পিছনে আমি আর এক শিখভদ্রলোক।

রূপেন বলল, "দেখেছেন দাদা এদিকে আম কাঁঠালের গাছ একেবারে নেই ?" স্বপ্না বলল, "অশত্থ বা বটগাছও দেখা যাচ্ছে না।" আমি বললাম, "সবই আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে।" মাত্র কয়েক মাইল এসে বাসগুলি থেমে গেল। রূপেন প্রশ্ন করল, "থামল কেন এখানে ?"

স্বপ্না আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "ঐ তো লেখা আছে চেক্ পোষ্ট পাঞ্জাব সীমান্ত।" মোটামুটি একটা চেকিং-এর পর বাসগুলি আবার চলতে সুরু করল।

স্বপ্না বলল, "আমরা তো এখন কাশ্মীর ও জম্মু প্রদেশের মধ্যে দিয়ে চলেছি ?"

রূপেন জবাব দিল, তাইতো রাস্তার দুধারে ঝাউ ও আর শিসমের সুশীতল ছাওয়া। আর তারই পাশে কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে সৈনিকদের অসংখ্য তাঁবু।" স্বপ্না বলল, শুধু তাই নয়।' ঐ দেখ রাইফেলধারী সৈনিক সতর্ক দৃষ্টি রেখে পাহারা দিচ্চে চারিদিকে।" রূপেন বলল, "এবার দেখ কি সুন্দর কাশফুল উষর ভুমিতে ঢেউ খেলে যাচ্চে বাতাসে।"

স্বপ্না জবাব দিল, "তাই বুঝি অসম্ভব গরম হাওয়া এখানে।" রূপেন জানাল, "একে আশ্বিনের পড়ন্ত রোদ, তায় আবার উত্তপ্ত বালির তাত।"

বাসটি কয়েকবার নদীগর্ভের মধ্য দিয়ে পার হয়ে এল। নদীর স্বল্প জল ফুলঝুরির মত উপর দিকে উঠে ছড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর বাসটি একটি নদীর সেতু পার হল। স্বপ্না প্রশ্ন করল, "এটা আবার কি নদী দাদা, আমরা কতদূর এলাম?" "দাঁড়াও কাউকে জিজ্ঞাসা করি।"

আমাদের ডান পাশ থেকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, "এটা তাওয়াই নদী, আমরা জম্মু শহরে পৌঁছে গেলাম।"

স্বপ্না হাসিতে উপচে পড়ে বলল, "ওমা তাই বুঝি?" তারপর হাতঘড়ি দেখে বলল, "মাত্র ৫৭ মাইল রাস্তা আসতে তিনঘণ্টা সময় নিল?" ভদ্রলোক মৃদ হাসলেন। রূপেন জবাব দিল, "পাহাড়ের চড়াই রাস্তা যে।" বাস ডাকবাংলোর আঙ্গিনার মধ্যে এসে অন্য বাসের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। সকলকে নামতে দেখে স্বপ্না বলল, "চলুন দাদা, আমরাও নেমে পা দুটো একটু ছাড়িয়ে নিই।"

জম্মু বেশ বড় সহর। যাকে বলে জমজমাট। ডাকবাংলোর মধ্যে লোকে লোকারণ্য। আমরা এখানে চা খেয়ে বাসে উঠলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে বাস জম্মু ছেড়ে কুদের পথে এগিয়ে চলল।

বেশ কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে স্বপ্না প্রশ্ন করল, "আচ্ছা দাদা, আর একটা যে শহর দেখে এলাম ওর নাম কি?" বৃদ্ধ বললেন, "জম্মুর পর অপর একটি শহর উধমপুর।" স্বপ্না বলল, "ওখানেও তো বহু বাড়ি ঘর দেখা গেল?" বৃদ্ধ বললেন, "হ্যাঁ। প্রায় হাজার পঞ্চাশ লোক ওখানে বাস করে।"

দিনের শেষে ঘোমটা প'রে অন্ধকার নেমে এ'ল চারদিকে। ড্রাইভার সার্চলাইট জ্বালিয়ে বাসের গতি বাড়িয়ে দিল। রাস্তার দুধারে গভীর জঙ্গল। ভীষণ গর্জন করে বাস পাক খেতে খেতে ক্রমশঃ উঠে চলেছে উপরে। রাত আটটায় কুদের ডাকবাংলোতে বাস এসে থেমে গেল।

স্বপ্নার ইচ্ছে ছিল একখানা পৃথক ঘর ভাড়া করে তারা থাকবে। আমার ব্যবস্থা তারাই করবে। খরচা যা পড়ে তারাই দেবে। রূপেন চেষ্টার ত্রুটী কবল না, কিন্তু ঘর পাওয়া গেল না। এমন কি মোটা বখ্শিসের লোভ দেখিয়েও না।

কোন রকমে রাতের খাওয়া শেষ করে স্বপ্না আমাদের সঙ্গে চলে এল। হলে খাটিয়াতে পাশাপাশি রূপেন ও আমার বিছানা হয়েছে। তারই মাঝখানটা দেখিয়ে স্বপ্না বলল, "ওরা যদি এখানে মেঝের উপর আমার বিছানা করে দিত, তাহলে নির্ভাবনায় রাতটা কাটান যেত।"

রূপেন বলল, "মেয়েদের সঙ্গে একটা রাত কোনরকমে কাটিয়ে দাও।"

আমি সাহস দিয়ে বললাম, "কোন ভয় নেই তোমার, আমরা তো প্রায় পাশেই রইলাম।" ক্ষুণ্ণ হয়ে সে চলে গেল। কুদ প্রায় ন' হাজার ফুট উঁচু। হাড় কাঁপান শীত এখানকার। আমরা জড়সড় হয়ে কম্বল দিয়ে শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরে রূপেনের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মাথা থেকে কম্বল সরিয়ে বলল, "দাদা শীঘ্র আসুন, স্বপ্না ওখানে ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছে।"

ধড়মড় করে উঠে দেখি, বিজলি বাতিগুলো জ্বলছে। শয্যা সব খালি। কম্বল জড়িয়ে বারান্দায় বার হয়ে দেখি, পূব আকাশের গায় লালাভা উঁকি দিচ্ছে। বারান্দার অপর প্রান্তে এক গেরুয়াধারীকে কেন্দ্র করে হৈ চৈ চলছে। তারই এক পাশে ম্লান মুখে স্বপ্না দাঁড়িয়ে।

আমি এসে সকলের প্রতি একবার দৃষ্টি বুলিয়ে প্রশ্ন করলাম, "কি হয়েছে রূপেন?"

সন্ন্যাসীকে দেখিয়ে রূপেন বললে, "মহারাজকে কে নাকি চোর বলেছেন, উনি স্বপ্নাকে সেজন্য চাপ দিচ্ছেন।" আমি স্বপ্নাকে

জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি ওঁকে কিছু বলেছ ?" "না দাদা ওঁকে আমি কিছুই বলিনি। শোবার পর রাতে আমাদের মধ্যে কে একজন বললেন—স্নান ঘরের বাইরে এক সাধু শুয়ে আছেন। তারই উত্তরে অপরে কে বললেন—দেখবেন যেন চোর-টোর না হয়। কিন্তু উনি সকালে উঠে আমি ওকে চোর বলেছি বলে সোরগোল তুলেছেন।"

পরিষ্কাব বাংলায় আমি সন্ন্যাসীকে বললাল—"আপনি ওর সব কথাই শুনলেন। ও আমার ছোট বোন। সত্য কথা বলবার সৎসাহস ওর আছে। কথার পিঠে মহিলাদের মধ্যে কেউ চোর কথাটি উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু ওরা আপনাকে চোর না বললেও আমি আপনাকে চোর বলছি।"

একটি গুঞ্জন উঠল চারিদি:কে। এক প্রৌঢ়া মিষ্টি হাসির সাথে হাত নেড়ে সন্ন্যাসীকে বললেন, "আমরা বার বার বললাম আপনাকে কেউ চোর বলে নি, কিন্তু আপনি জল না ঘুলিয়ে ছাড়লেন না, এবার নিন্, ঠেলা বুঝুন।"

তাঁর কথা শেষ হলে আর এক বৃদ্ধা বলে উঠলেন, "ওমা যাব কোথায় ? যেমন বোন তেমনি তার ভাই। উনি আবার জাঁক করে সাধুকে চোর বলছেন। কলি কিনা পাপে চার পো ভরে গেছে।"

"তুমি থাম তো পিসি"—এক তরুণী পিছন থেকে বললেন। বৃদ্ধা হাতের লাঠিটা মেঝেতে ঠুকে বললেন, "থামবো কেন লো, কারো খাই না পরি যে, হক কথা বলতে ভয় পাব ?" "তোমার সঙ্গে আসাই আমার ঝকমারি হয়েছে।" "তোকে তো কেউ বেঁধে রাখেনি বাছা—যা না যেখানে খুশি। মুখে আগুন, ভগবানের অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে জন্মেছি, তাই উঠতে বসতে ব্যাঙের লাথি খাচ্ছি।"

এক যুবক বৃদ্ধাকে বুঝিয়ে হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন। বেশ ভিড় জমে গেছে। সন্ন্যাসী এবার আমাকে বললেল, "বাবুজী আপনার এ কিমন কোথা হোল ? না হয় আপনি লিখাপড়া জানা

বড় আদমী আছেন।" আমি একমুখ হাসির সঙ্গে বললাম, "সাধুজী চুরি একটি মহাবিদ্যা, ৬৪ কলার একটি বিশেষ অঙ্গ। পুরাকালে চুরি বিদ্যা শেখা বাধ্যতামূলক ছিল। তখনকার দিনে ধেনু অপহরণ তো নিত্যকার ঘটনা। তারপর সীতা হরণ, সুভদ্রা হরণ, পারিজাত হরণ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহাকাব্যে স্থান পেয়েছে। আর ভগবান কৃষানজী দই ক্ষীর থেকে সুরু করে শেষ পর্যন্ত নারীদের বস্ত্রহরণ করেই তো প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

"এ যুগেও একাধিক 'মন' চুরি না করতে পারলে বেকুব বলে সমাজে অপাঙক্তেয় করে দেয়। সাধুজী আপনি একাই চোর নন, আজ আপনি, আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব চোরে ভরে গেছে।"

ফুল বাগানে শিশির বিন্দুর উপর রোদ পড়ে ঝিক্‌মিক্ করছে। তারই সঙ্গে চারদিক থেকে অজস্র হাসির ঢেউ উঠে সকালের গুমোট ভাবটি কাটিয়ে সকলকে উৎফুল্ল ক'রে তুলছে।

পাশ থেকে এক যুবক বললেন, "সাধুজী এ বড় শক্ত পাল্লা, মানে মানে এবার পথ দেখুন।"

সন্ন্যাসীর মুখে চোখে সারল্যের হাসি ফুটে উঠল। "বাবুজী ভালা আদমী, সাচ্ কহা হ্যায়। আভি দুনিয়ামে সাচ্চা আদমী কোই নেহি হ্যায়।" কথাক'টি বলতে বলতে সন্ন্যাসী স্থান ত্যাগ করলেন।

আমিও চলে এলাম। ভিড় ফাঁকা হয়ে গেছে! এক যুবক আমার পাশাপাশি আসতে আসতে বললেন, "আমি দাদা প্রথম থেকেই বৌদির পক্ষ নিয়ে সমর্থন করেছি। কিন্তু ঐ বুড়িটা না, একেবারে জটিলা কুটিলা ঠাক্‌রুণ। সকাল বেলায় যা একখানা ঝাড়লেন না, সাধুর একেবারে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "কি নাম আপনার? কতদূর যাবেন?" তিনি উত্তরে জানালেন, "আপনাদের সঙ্গেই কাশ্মীর চলেছি। নাম

আমার মৃণালকান্তি সেন। মধ্যে মধ্যে আমাকে স্মরণ করলে আনন্দ পাব খুব।" হেসে বললাম, "আলাপে খুশী হলাম, কাশ্মীরে গিয়ে নিশ্চয়ই আবার আমাদের দেখা হবে।"

কিছুক্ষণের মধ্যে রূপেন ও স্বপ্না এসে ঘরে ঢুকল। রূপেন বলল, "স্বপ্না ওখান থেকেই তো তুমি সব সেরে আসতে পারতে।"

আমার দিকে চেয়ে স্বপ্না প্রশ্ন করল, "এখানে কি কিছু অসুবিধা হবে দাদা?" "অসুবিধা কিসের? স্নাম ঘর তো খালি পড়ে রয়েছে। লোকজন সবই তো চলে গেছেন দেখছি।" রূপেন বলল, "এই ফাঁকে তবে তুমি সেরে নাও আমি চলি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় রূপেন?" স্বপ্না জবাব দিল, "সকাল ও সন্ধ্যায় নিরিবিলিতে ওঁর একটু লেখার অভ্যাস আছে।" "কই এ কথা তো তুমি আমাকে বলনি স্বপ্না?" "বলবার আর সময় পেলাম কৈ। ইচ্ছে তো ছিল অনেক কিছু বলবার।" রূপেন বলল, "ঐ বুড়ি স্বপ্নার সব প্রোগ্রাম ভেস্তে দিয়েছে দাদা।"

"ভয় নেই রূপেন, কাশ্মীরে আবার দেখা হলে আমি ভাল করেই সমঝে দেব বুড়িকে।"

"না দাদা, এমন কথা মুখে আনবেন না।" ভীরু চোখে স্বপ্না আমার দিকে চেয়ে রইল।

"তোমার এত ভয় পাবার কি আছে বুড়িকে?" "না দাদা ভয় নয়, তাঁর কাছে আমি উপকৃত। কাল রাতে ও ঘরে আর জায়গা ছিল না। উনি ওঁর ভাইঝি অলকার কাছেই আমার শোবার ব্যবস্থা করে দেন।" রূপেন প্রশ্ন করল, "তবে উনি তোমার উপর সকালেই এত খাপ্পা হলেন কেন?" "আমার ধারণা অলকাই ওর পিসিমাকে সন্ন্যাসীর ঘটনাটি বিকৃত করে আমার নামে লাগিয়েছে।" "তার মানে? সেই বা তোমার উপর বিরূপ হল কিসে?"

"সেই তো সমস্যা, ভাববার বিষয়।"

আমি এবার বললাম, "মেয়েদের মধ্যে এত কূট বুদ্ধি ?" "দাদা পুরুষদের তো সরল মন। মনে যা হল মুখে তা প্রকাশ করে দিল। এক একজন মেয়ের কাছে চাণক্যের কূটবুদ্ধিও ঘোল খেয়ে যায়।"

"তাই তো দেখছি।"

স্বপ্না বলে চলল, "অথচ কাল রাতে অলকা তার অতীতের অনেক ঘটনা প্রকাশ করে ফেলল। বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে ও বিধবা, এখন তার ঐ পিসিই একমাত্র সম্বল। এখনি ওখান থেকে আসবার সময় সে তার পিসির জন্য আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিল। বলল, 'পিসির মাথা খারাপ দিদি, একমাত্র ভাইকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলেন কিনা। বাবার মৃত্যুর পর ঐ রকম হয়ে গেছেন। তুমি আমার হয়ে দাদাদের বলো দিদি—তাঁরা যেন আমার মুখ চেয়ে আজকের ঘটনা সব ভুলে যান। এই বয়সে আমি সর্বস্ব হারিয়ে পথের ভিখিরি হয়েছি।' বলবার সময় দুটি চোখ তার দরদর ধারায় জলে ভেসে গেছে।"

স্বপ্নাও দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার চোখ মুছল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা ঐ যুবকটি ওদের কে, যিনি পিসিমায় হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন ?" "সেটাও এক হেঁয়ালী। আর কারুর সঙ্গে যে তাদের আলাপ হয়েছে সে কথা কিছু ভাঙেনি।"

রূপেন বলল, "ছেড়ে দাও ও সব কথা।" স্বপ্না ম্লান মুখে বলল, "যেভাবে আজ দিন সুরু হল জানি না কিভাবে এর সমাপ্তি হবে ?"

"কি আবার হবে ? আমরা তো আছি, তুমি ওঠো তো এখন।" রূপেন স্বপ্নার পিঠে একটা চাপড় মারল। স্বপ্না কৃতজ্ঞতা ভরা চোখ চেয়ে আমাকে বলল, "দাদা আমাদের ভাগ্য ভাল, তাই আপনার মত সঙ্গী পেয়েছি। কিন্তু আপনার ঋণ ?" আমি তার কথায় বাধা দিয়ে বললাম, "দেখ স্বপ্না আমি ভবঘুরে লোক, গান

আমি সত্যই ভালবাসি, সাহিত্যও মন্দ লাগে না, কবিতা যৎ-কিঞ্চিৎ। কিন্তু এই প্যানপেনে সুর আমার অসহ্য। তুমি এরকম করলে আমার হাতে মার খাবে, বড় হয়েছ বলে রেহাই পাবে না।"

রূপেন তাড়াতাড়ি আমাকে প্রণাম করে বলল, "দাদা পায়ের ধুলো দিন, আমি চললাম, আপনি সামলান আপনার বোনকে।"

কথাটি বলে সে দরজার বাইরে পা দিল। "লক্ষীটি, এক কাপ চা খেয়ে যেও কিন্তু"—স্বপ্না অনুরোধ জানাল। আন্তরিকতাপূর্ণ সুর তার গলায় ধ্বনিত হল। সেই সঙ্গে চোখ ও মুখ দিয়ে এক মাধুর্যের দৃশ্য ফুটে উঠল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভৃত্য স্নান ঘরে দু'বালতি গরম জল দিয়ে গেল। স্বপ্না খুশী হ'য়ে বলল, "দেখলেন দাদা, পয়সা ফেললে কুদে সব পাওয়া যায়।"

"হ্যাঁ তাইতো দেখছি। গরম জল থেকে গরম কম্বল পর্যন্ত।"

স্নান সেরে, চা খেয়ে আমরা বাসে এসে বসলাম। হাসি মুখে স্বপ্না বলল, "দেখুন দাদা আমাদের জিনিসপত্র যেভাবে রেখেছিলাম ঠিক সেইভাবেই আছে।"

পাশ থেকে এক মহিলা বললেন, "পাহাড়ী লোকেরা যে খুব বিশ্বাসী ও সৎ হয়।"

"তাইতো দেখছি, অথচ দেখেছেন ওরা কত অভাবী?"

"অভাবী হ'লেও ওরা সততা হারায় নি।"

"তা কেমন ক'রে সম্ভব, অভাবেই তো লোকের স্বভাব নষ্ট হয়।"

"সব সময় তা হয় না ভাই। স্বভাব দোষেই কুকর্ম করে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "রূপেন কোথায় স্বপ্না?" "নিকটেই কোথাও আছেন, হর্ণ শুনলে এসে পড়বেন।" "তুমি বস, আমি উপরটা একটা চক্র দিয়ে আসি।" "ওমা, আমি কি করলাম! আমিও সঙ্গে যাব।" পাশ থেকে ভদ্রমহিলা বললেন, "যান না আপনারা, বাস ছাড়তে এখনও অনেক দেরী আছে।"

স্বপ্না তাঁকে প্রশ্ন করল, "আপনারা বোধহয় কলকাতা

থেকে ?" "হ্যাঁ ভাই, শিকদার বাগান, আপনারা ?" "নিউ আলিপুর দিদি।"

রাস্তা ছেড়ে আমরা ডাকবাংলোর উপর স্তরে উঠলাম। স্বপ্না বলল, "ও দাদা এখানে যে দেখছি ঘরের লাগোয়া বাথরুম, আবার ড্রেসিং টেবিলও আছে, সুন্দর ব্যবস্থা।" "তাইতো অনেক ঘরও আছে, কাল রাতে এদিকে আমরা আসি নি।"

পায়চারি করতে গিয়ে আমরা একটি সাদা দড়ির টানা ডিঙালাম। পরক্ষণেই এক সৈনিক এসে সামনে দাঁড়াল। তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলে সে ইঙ্গিতে তাঁবু দেখিয়ে দিল। সেদিকে দৃষ্টি ফেরাতেই এক অফিসার হাত নেড়ে ডাকলেন।

তাঁর কাছে এলে ভদ্রলোক চেয়ার দেখিয়ে ইংরাজিতে বসতে অনুরোধ করলেন। বসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন, "ওদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন ?"

উভয়ে বললাম, "ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে ছিল, অন্য কিছু হয়।"

"এটা যে সৈনিকদের আবাস, সংরক্ষিত অঞ্চল সাধারণের প্রবেশ নিষেধ যে।"

"সেজন্যে আমি দুঃখিত, অন্যমনস্ক থাকায় লক্ষ্য করিনি।"

স্বপ্না চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলল "চলুন দাদা।" ভদ্রলোক এবার পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "উঠছেন কেন ? আপনাদের বাস ছাড়বার এখনো দেরী আছে বোন।"

উপছে পড়া হাসির সাথে স্বপ্না বলল, "ভারি মিষ্টি তো আপনার মুখে বাংলা কথা ?"

"বাংলা কথাই যে মিষ্টি দিদি। আমি আর কতটুকু শিখেছি ? রবীন্দ্রনাথ সারা বিশ্বে বাংলা ভাষার মর্যাদা যে বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন।"

"কোথায় শিখলেন এমন সুন্দর ভাবে বলতে ?"

"কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামে। তা ছাড়া আমাদের সহকর্মী

অনেক বাঙ্গালী অফিসার আছেন।" আমি প্রশ্ন করলাম, "সর্দারজী আপনার বাড়ি কোথায় ?"

"ওর বাড়িতো পাঞ্জাবে হবে দাদা ?"

"না বোন, বাবুজী জানতে চেয়েছেন—পশ্চিম পাঞ্জাবে কি না, অর্থাৎ বাড়ি আমার পাকিস্তানে পড়েছে কি না ?"

স্বপ্না আমার চোখে দৃষ্টি ফেলে ইসারায় জানতে চাইল সত্য কি না ?

আমি মাথা নেড়ে জানালাম ঠিক তাই।

দেখি ভদ্রলোকের দৃষ্টি গিরিমালা, বনানী ভেদ করে সুদূর দিকচক্রবালে গিয়ে নিশ্চল হ'য়ে গেছে। মাত্র ক'এক মুহূর্ত। তারপর ধরা গলায় বললেন, "বাবুজী আপনার অনুমান নির্ভুল। সেখানে আমি আমার বাড়িঘরের সঙ্গে উপযুক্ত দুই ছেলেকেও হারিয়েছি।" দীর্ঘ বলিষ্ঠ প্রৌঢ় শিখ ভদ্রলোকের অশ্রু ঝরে পড়ল শ্মশ্রু বেয়ে।

স্বপ্না ভদ্রলোকের একটি হাত দুহাতে জড়িয়ে বলল, "সর্দারজী ভাইয়া, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন, আমরা না জেনে আপনার ক্ষতস্থানে আঘাত দিয়েছি।"

ভদ্রলোক ম্লান হেসে বললেন, "না বোন, আপনারা তো কোন অন্যায় করেন নি।"

"পরিচয়ের প্রথম ধাপ পার হ'লেই তো ঘরোয়া কথা সুরু হয়। ছেলেদের মৃত্যুর জন্য আমি দুঃখিত নই। তারা লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে। আমার আপশোস আমি তখন দেশে ছিলাম না।"

"তখন কোথায় ছিলেন আপনি ?" স্বপ্না তার অন্তর ভরা শ্রদ্ধা ঢেলে জানতে চাইল।

"সে সময় আমি সরকারী কাজে কাইরোতে ব্যস্ত ছিলাম বোন।"

আমাদের বাসের ভেঁপু বার বার বেজে উঠল। ভদ্রলোক

এবার হাসিমুখে আমাকে বললেন, "বাবুজী এবার যে আপনাদের উঠতে হবে, বাস ছাড়বার সময় হল।"

আমি উঠে তাঁর হাত ধরে বললাম, "সর্দারজী আমাকে ক্ষমা করুন।"

ভদ্রলোক আমার হাত ধরে চলতে চলতে বললেন, "ও কিছু নয় বাবুজী, আপনি আমার বন্ধু। বাঙ্গালী পঞ্জাবী ভাই ভাই। যে জাতের মধ্যে নেতাজী সুভাষ ও লালা লাজপত রায় জন্মান সে জাতের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন চির অচ্ছেদ্য। তাদের বন্ধুত্ব চির অক্ষয়।"

বাসে উঠে স্বপ্না বলল, "সর্দারজী দাদা, এবার কলকাতায় গেলে এ বোনের গরীবখানায় উঠবেন, এই আমার মিনতি। বলুন— কথা দিন।"

"তাই হবে বোন। একবছর পরে আমি কলকাতায় আমার বোনের দৌলতখানায় উঠে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব।"

আমি বাসে উঠলে কুদের ভারপ্রাপ্ত সম্ভ্রান্ত মিলিটারী অফিসার জানলার কাছে এসে স্বপ্নাকে সসম্মানে অভিবাদন দিয়ে বললেন, "জয়হিন্দ্।"

বাস ভর্তি লোকের সম্মিলিত "জয়হিন্দ্" ধ্বনির সাথে স্বপ্নার জয়হিন্দ্ ধ্বনি মিলিয়ে গেল কুদের উপত্যকা, অধিত্যকায়। প্রতিধ্বনিত হ'ল আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা সর্বাধিনায়কের অমরবাণী "জয়হিন্দ্"। বেলা নটায় বাসগুলি কুদের ডাকবাংলো পিছনে ফেলে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল।

রূপেন আমার সীটে বসে তার লেখা কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিল। আমাকে বলল, "দাদা আপনি স্বপ্নার পাশে সামনে বসুন, আমি এগুলো একটু গুছিয়ে নিই।"

আমি স্বপ্নার পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, "রূপেন সেই শিখ ভদ্রলোক ফেরেন নি?"

"কই দেখি নি তো, মনে হয় এখানকার যাত্রী ছিলেন।" তারপর হাসিমুখে বলল, "ব্যাপার কি স্বপ্না, ভোর না হতেই তো কুদের ডাকবাংলোতে সন্ন্যাসীকে নিয়ে একাঙ্ক নাটক জমিয়ে দিলে ? আবার সাড়ে ছ ফুট লম্বা এ মিলিটারী অফিসারকে জপালে কেমন ক'রে ? তোমার বাহাদুরী আছে বলতে হবে।"

স্বপ্না ঠোঁটে হাসির ঝিলিক্ তুলে বলল, "বাহাদুরী তো নিশ্চয়ই। বহুদিনের সঞ্চিত জমাট বাঁধা কঠিন তুষার স্তূপ ভাই-এর উষ্ণ ভাষণ পেয়ে দ্রবীভূত হ'ল। সময় বুঝে বোন তার শ্রদ্ধার বাঁধন শুদ্ধভাবে জড়িয়ে দিল চারপাশে।"

ডান পাশ থেকে সেই বৃদ্ধ বললেন, "খাসা উপমাটি দিয়েছে মা লক্ষ্মী। জয়হিন্দ্ ও শ্রদ্ধা বা স্নেহের বাঁধনের কথা শুনে বহু পুরাতন কথা মনে পড়ে গেল। আজ সাধারণের কাছে সেগুলি বিস্মৃতির তলে তলিয়ে গেছে।"

স্বপ্নার সাথে আরও অনেকে কৌতূহলী হ'য়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

বৃদ্ধ সুরু করলেন, "কলকাতার ঠাকুরবাড়ি তখন শিক্ষা দীক্ষা ও সম্ভ্রমে ভারতে আভিজাত্যের গৌরবে গরীয়ান। এঁদের এক নিকট আত্মীয়ার বিয়ে হ'ল সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশে এক সম্ভ্রান্ত পাঞ্জাবী বংশে।

"প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কোনরকমে ইংরেজ জয়ী হলো ভারতীয় সাহায্য পেয়ে। প্রতিদানে ভারত পেল ১৯১৯ সালে ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড।

"অমৃতসর পার্কে পাঞ্জাবী নরনারী ও শিশুর শোণিতের বন্যায় ভাসিয়ে দিল জেনারেল ও ডায়ার।"

বাস ভর্তি লোক বৃদ্ধের কথা তন্ময় হ'য়ে শুনছেন। এক প্রৌঢ় বললেন, "পাঞ্জাব তো সে প্রতিশোধ নিয়েছে।"

"হ্যাঁ প্রায় বিশ বছর পর বীর উদ্ধম সিং বিলেতে মাইকেল ও ডায়ারকে রিভলবারের গুলিতে শেষ করেন। বাল্যের মর্মান্তিক জ্বালা সুদীর্ঘ সময়েও তিনি ভুলতে পারেন নি।"

পিছন থেকে কয়েকজন বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী ছাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, "তারপর?"

বৃদ্ধ সোজা হ'য়ে বসে বলে চললেন, "জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী সেই বাঙ্গালী কলকাতায় পত্র লিখলেন তাঁর মামাকে।

"সংবাদ পত্রে যা এতদিন অপ্রকাশিত ছিল, দরদী ভাগ্নীর পত্রের প্রতিছত্রে মূর্ত হ'য়ে ফুটে উঠল বীভৎস নগ্ন হত্যাকাণ্ডের করুণ কাহিনী।

"সরলাদেবীর পত্র শেষ করে স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলেন রবীন্দ্রনাথ। কয়েকদিন পরে সংবাদপত্রে প্রকাশ পেল—বিশ্বকবি ঘৃণাভরে ব্রিটিশ সরকারের প্রদত্ত 'নাইট হুড' উপাধি বর্জন করেছেন। তখনকার দিনে এতবড় খেতাব রাজা মহারাজারাও পেতেন না। বর্তমান যুগের ভারতরত্নের মতই দুষ্প্রাপ্য ছিল।"

এক যুবক বললেন, "বিশ্বকবি যে স্যার হ'য়েছিলেন একথা তো আমরা জানতাম না।"

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, "এ রকম ঘটনা ইংরেজ রাজত্বে এই প্রথম ও শেষ। আপনারা জানবেন কেমন ক'রে। সে কি আজকের কথা? তখন হয়ত আপনারা জন্মান নি।"

এ সব কথা বৃদ্ধের কানে গেল না। তিনি উদ্দীপনা ভরে সুরু করলেন আবার, "ভারতীয় মহিলাদের উদ্দেশ্যে কটুক্তি করার অপরাধে বাঙ্গালী ছাত্র কর্তৃক কলেজ অধ্যক্ষ ওটেন সাহেব পদাঘাত খেলেন। ফলে যুবক কলেজ থেকে বিতাড়িত হলেন চিরতরে।"

অপর একজন যুবক শ্লেষ হেসে বললেন, "ছাত্র হ'য়ে অধ্যক্ষকে

একেবারে পদাঘাত ?" বৃদ্ধ উত্তেজিত হ'য়ে বললেন, "এতো ফুটবল বা হকি ম্যাচ্ নয় যে ঝগড়া বাধলে বন্ধুদের মধ্যে হাতাহাতি হবে ? মাতৃজাতির অবমাননার যোগ্য প্রত্যুত্তরই সেদিন দিয়েছিলেন তিনি।"

প্রৌঢ় বললেন, "ছেড়ে দিন ওর কথা, তারপর ?"

"এর কয়েক বছর পর স্যার আশুতোষের চেষ্টায় যুবক স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ভারতে তখন স্বাধীনতার আন্দোলন সুরু হয়েছে দিকে দিকে। বাংলায় তখন অগ্নিযুগ। পথে ঘাটে বোমা ফাটছে। যুবকরা দলে দলে 'অনুশীলন সমিতি', 'ব্রাদার হুড', ক্লাব, প্রভৃতিতে নাম লিখিয়ে বক্সিং, লাঠি ও ছোরা খেলার তালিম নিচ্ছে।

"এ যুবকও বাদ যান নি। নীচে পড়ার ঘরে সমিতির জরুরী সভা বসেছে। সুনিশ্চিত কর্মপন্থার চূড়ান্ত রূপদানে অধিবেশনের সকলেই ব্যস্ত। হঠাৎ দ্বারে আঘাত পড়ল। কাগজপত্র লুকিয়ে ফেলে যুবক কপাট খুললেন নিজে।

"যুবককে লক্ষ্য করে ভৃত্য বলল, "মেজবাবু আপনাকে ডাকছেন। যুবক সেই মুহূর্তেই ভৃত্যের অনুসরণ করলেন। বন্ধুরা সকলেই জানেন, মেজদা রাশভারি লোক। আদর ও শাসন তিনিই করে থাকেন ছোট ভাইদের। তাঁকে সমীহ ক'রে চলেন সকলে।

"যুবক মেজদার ঘরে ঢুকে দেখেন—তাঁর বাবা গম্ভীর হ'য়ে বসে আছেন ইজিচেয়ারে। কোন ভূমিকা না ক'রেই মেজদা বললেন, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার এখনও আটমাস বাকি আছে। চেষ্টা করলে তৈরী হওয়া যায়। আটমাস সময় বড় কম নয়। গোছগাছ করে যত শীঘ্র পার রওনা হয়ে পড়। মনে রেখো এইটাই তোমার শেষ সুযোগ।"

বাস ভর্তি লোক ঔৎসুক্য ভরা চোখ মেলে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে আছেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, "তারপর ?"

"যুবক বুঝতে পারলেন পিতার উক্তিই তাঁর মেজদার মুখ দিয়ে ব্যক্ত হ'য়েছে। যে কোন উপায়ে ওঁরা তাঁকে দেশছাড়া করতে চান। বাবা জাঁদরেল সরকারী উকিল। রাশভারি লোক। দেশের বর্তমান অবস্থায় পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে বিচলিত হ'য়েছেন।"

আশপাশ থেকে প্রশ্ন উঠল, "তারপর?" "ম্লান মুখে ফিরে এসে যুবক বন্ধুদের সব কথা জানালেন—দু বছর পড়ে যা সম্ভব নয়, মাত্র আট মাসে তা কেমন ক'রে সম্ভব হবে? কিন্তু এখন সে কথা ওঁদের বললে আমার বিলাত যাওয়া হবে না ভাই। তোমরা মন খারাপ ক'রো না। দেখতে দেখতে আটমাস সময় কোথা দিয়ে কেটে যাবে। আমি তো তোমাদের—।"

এক যুবক প্রশ্ন করলেন, "যখন দু বছরের কোর্স তখন ওঁকে কেন আটমাত্র মাস সময় দেওয়া হ'ল?"

বৃদ্ধ বললেন, "চব্বিশ বছর পর্যন্ত পরীক্ষার নির্দিষ্ট সময়। রাস্টিকেটেড্ হওয়ায় ওঁর সময় নষ্ট হ'য়ে যায়।"

প্রৌঢ় বললেন, "বলুন তারপর?"

"আট মাসেই যুবক অসাধ্য সাধন করলেন। ইংরাজিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সিভিল সার্ভিসে চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন।"

"অদ্ভুত ব্রেন!"—কয়েকজন ভদ্রলোক পাশ থেকে বলে উঠলেন।

প্রৌঢ় বললেন, "সত্যিই অদ্ভুত ব্রেন।" "তারপর?" বৃদ্ধ বলে চললেন, "আর এতবড় সম্মানিত পদের জোড়া ভারতে আর নেই। সিভিলিয়ানরাই তো ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইস্পাত স্তম্ভ। এ স্তম্ভের কোন একটি দুর্বল হ'লে, সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব যে বিপন্ন হবে। ইতিমধ্যেই বক্তৃতার মাধ্যমে যুবক তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলেছেন বিলাতে। প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করলেন, "সেটা মনে হয় ১৯২১ সালে।"

বৃদ্ধ বললেন, "হ্যাঁ, তখন ভারতে গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনও দানা বাঁধতে সুরু করেছে। এ যুবক ইতিহাসেও দৃষ্টান্ত রেখে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে বোম্বাই পৌঁছুলেন। বিলাতে টোরিদল হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।" প্রৌঢ় জোরে শ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন "তারপর?"

"যুবক একেবারে গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করে বললেন ইংরাজের গোলামি আমি করব না। দীন সেবক হয়ে ভারতমাতার সেবা করব আজীবন। আপনি আমাকে আদেশ করুন।"

আশপাশের যুবকদের মুখে চোখে উত্তেজনার ভাব দেখা দিয়েছে। তাঁরা অধীর হয়ে বললেন, "তারপর, তারপর?"

বৃদ্ধ বললেন, "যুবকের এই ব্যবহারে গান্ধিজী হতবাক হয়ে পড়েছেন। মনে মনে বলছেন, "একি সত্যই সম্ভব? ধনকুবের রায়-বাহাদুর জানকী বসুর শ্রেষ্ঠ রত্ন স্বর্ণ-সিংহাসনের মোহ ত্যাগ করে দেশের কাজের জন্যে তাঁর আদেশ প্রার্থী?" গান্ধিজী আবেগে যুবককে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ধন্য যুবক, তুমি ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান। মা যে তোমাদের মত সন্তানদের মুখ চেয়ে বসে আছেন। তাঁর শৃঙ্খল মোচনের দায়িত্ব যে তোমাদের। তুমি এই পত্র নিয়ে মিঃ সি আর দাশের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।

"যুবক কলকাতায় এসে মিঃ দাশের সঙ্গে দেখা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ দাস তাঁর হাতে গড়া জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিদ্যাপীঠের সর্বময় কর্তৃত্বের ভার যুবকের হাতে তুলে দিলেন।

"১৯২২ সালে মিঃ দাশ গয়া কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করলেন। কিন্তু গান্ধিজীর সঙ্গে কাউন্সিল বর্জন নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিল। চিত্তরঞ্জন সেই রাত্রেই এই যুবকের হাত ধরে গয়া ত্যাগ করলেন গভীর দুঃখে।

"১৯২৩ সালে জানুয়ারীতে চিত্তরঞ্জন বাংলায় স্বরাজ্য পার্টি গঠন

করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে বৃহত্তর অংশ দখল করে বসলেন। তাঁর এই সাফল্যে চিত্তরঞ্জন 'দেশবন্ধু' নামে ভূষিত হ'য়ে সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তার করলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত মালব্যজী প্রভৃতি এই পার্টিতে যোগ দিয়ে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করলেন। এ যুবক এইবার প্রথম প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক হয়ে ফরওয়ার্ড পত্রিকার দায়িত্বভার নিজ কাঁধে তুলে নিলেন।"

ভদ্রলোকের কথা তখনও শেষ হয়নি, তিনি বলে চলেছেন আবেগে, "১৯২৪ সালে কাউন্সিল নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টি বিরাট সাফল্যলাভ করল। সাফল্যের মূলে দেশবন্ধুর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও এ যুবকের অভূতপূর্ব সংগঠন শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল।

"সুরেন বাঁড়ুজ্জে, এস. আর. দাশ প্রভৃতি গভর্ণমেণ্টের বড় বড় চাঁই ও খয়েরখাঁদের ডিগবাজি খাইয়ে বিধান রায়, সাতকড়িপতি রায় প্রভৃতি বিপুল ভোটে জয়ী হ'য়ে বাংলার কাউন্সিলে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করলেন। সমগ্র ভারত পঞ্চমুখে দেশবন্ধুর প্রশংসা ক'রে তাঁর নেতৃত্ব মাথায় করে নিলেন।

"তারপর কলকাতা কর্পোরেশন কংগ্রেস দখল করল। দেশবন্ধু প্রথম মেয়র নির্বাচিত হলেন। আর যুবক সুভাচন্দ্র হলেন কর্পোরেশনের সর্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে তাঁরই অধীনে প্রধান কর্মসচিব।

"সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এক অলৌকিক শক্তি বলে বৃটিশের চোখে ধূলি দিয়ে ইউরোপ পাড়ি দিলেন। সেখানে পৌছে স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করলেন নিজ দক্ষতায়। রুশ, জার্মাণ, ইটালী, জাপান প্রভৃতি দেশ স্বাধীন ভারতের স্বীকৃতি দিল। যাদুবলে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করলেন। তারপর সম্মুখ সমরে বৃটিশকে পরাভূত করে ভারতের মৃত্তিকায় মণিপুরে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করলেন এই বীর নেতাজী সুভাষ।"

পিছন সারি থেকে বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী ছাত্রদের সম্মিলিত গানে বৃদ্ধের কথা চাপা পড়ে গেল,

"চলো দেহ্‌লী পুকারকে
কৌমী নিশান সামালকে
লাল কিল্লে গাড়কে
লহ্‌রায়ে জা লহ্‌রায়ে জা
কদম কদম বাঢ়ায়ে জা'
নেতাজী সুভাষ জিন্দাবাদ।"

কখন বাস থেমে গেছে, গল্প ও গানে কারুই সেদিকে খেয়াল নেই। অন্য বাসের যাত্রীদের নামতে দেখে আমরাও উঠে পড়লাম।

"এ কোথায় এলাম দাদা ? বাস থেকে সকলে নেমে পড়েছেন ? স্বপ্নার প্রশ্নে বৃদ্ধই উত্তর দিলেন, "জায়গাটির নাম 'বাটোট'। কুদ থেকে ২০ মাইল এসেছি মা।" "এখানে থামল কেন জ্যেঠামশায় ?"

"রাস্তাটা একমুখী যে মা, সেইজন্য মিলিটারী নিয়ন্ত্রিত।"

"কতক্ষণ দাঁড়াবে এখানে ?" স্বপ্না বৃদ্ধের দিকে তাকাল।

বৃদ্ধ হেসে বললে, "কম করে ছ'ঘণ্টা। তার বেশিও হ'তে পারে। পাঠানকোটগামী সব গাড়িগুলোকে পাস করিয়ে তবে আমাদের রাস্তা ছেড়ে দেবে। যাও না নীচে নেমে এদিক সেদিক একটু ঘুরে এস।"

বৃদ্ধের কথা শুনে আমরাও সকলের সাথে নেমে পড়লাম বাটোটে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাস থেকে নেমে দেখি লম্বা একটা গাড়ির সারি পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তা ক্রমশঃ চড়াইয়ে উঠে গিয়ে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়েছে। শ্রীনগর থেকে আপেল বোঝাই মটর বাস ও লরীগুলি পিঁপড়ের সাড়ির নত লাইন দিয়ে নেমে আসছে। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরণার জল ঝিরঝির করে ড্রেনে পড়ে তরতর করে বয়ে চলেছে।

আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে আমরা পাহাড়ে উঠলাম। জায়গাটি নির্জন ও সমতল। পাশেই ডালিমের বাগান। খুশীতে উপচে পড়ে স্বপ্না বলল, "লাভলি, কি সুন্দর? হাত দিয়ে ডালিমগুলো নাড়া-চাড়া করতে ইচ্ছে করছে।"

রূপেন বলল, "ভাল কথা নয়, তার পরের ইচ্ছেটা ভেবে দেখেছ?"

"আহা আমরা তোমাদের মত লোভী নই।"

"নিশ্চয়ই না, স্বর্ণমৃগ দেখে কার লোভ হয়েছিল, শুনি?"

"কার সঙ্গে কিসের তুলনা? একে হরিণ শিশু তার উপর সোনার। কি সুন্দর ভাব দেখি? শুনলেই মন খারাপ হ'য়ে যায়।"

"এও ঠিক সেই রকম। ডালিমের দানাগুলি ঠিক সেই রকম সুন্দর।" কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে রূপেন স্বপ্নার গালে একটি

টোকা মারল। "ভারি অসভ্য"—বলেই স্বপ্না রূপেনের হাতে ঝট্‌কা মারল। রূপেনের হাত থেকে ঝোলাটা পড়ে গেল।

রূপেন বলল, "ঝোলাটা ফেললে তো?"

"আমি ফেলি নি তোমার বুদ্ধির দোষে পড়েছে।"

"সেই কথায় আছে না পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। তোমার তাই…।"

পাহাড়ী ঝরণার মত স্বপ্না খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর ঝোলাটি উঠিয়ে বলল, "সে তো আমি গো মশায়। তোমার হাতে পাড়ছি! তুমি যা খুশি আমাতে দিয়ে তাই করিয়ে নিচ্ছ।"

"সেটা বিয়ের পর কিছুদিন অবশ্য চলেছিল। কিন্তু বছর ঘুরতেই আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। তারপরেই তো আমি তোমার হাতে পড়েছি।"

স্বপ্না হাসিতে ফেটে পড়ে পড়ল। তারপর ঝোলাটা দিয়েই জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে আমাকে বলল, "বসুন দাদা।" আমরা তিনজনা মুখোমুখি বসলাম। পিঠের উপর ছড়ান চুলগুলিকে একটা এলো খোঁপা বেঁধে স্বপ্না ঝোলা থেকে আপেল বার করে ছাড়াতে লাগল। তারপর রূপেনকে লক্ষ্য করে বলল, "দেখ মেয়েদের যত জারিজুরি সমসময় পুরুষের সাহচর্য পেয়েই—বাপ, ভাই, স্বামী ছেলে কারুর না কারুর উপর নির্ভর করে। তা কি সেকালে আর কি এখন প্রগতির যুগে।"

রূপেন বলল, "সেটা ঠেলায় পড়লে স্বীকার কর, কি বলেন দাদা?"

আমি বললাম, "রাইট ইউ আর—"

স্বপ্না কোন মন্তব্য না ক'রে হেসে অর্দ্ধেকটা আপেল টুকরো করে আমার হাতে দিয়ে বলল, "খান দাদা।" বাকিটা রূপেনের হাতে দিয়ে আর একটা আপেল বার করল।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "দাদা বাইরে থেকে

দেখে আপনার ভাই-এর ভিতরটা যেন বিচার করবেন না। তাহলে বড় ভুল করবেন।"

রূপেন বলল, "ও নিজের বুঝি ভিতর বার দুটোই সমান, এটাই দাদাকে বোঝাতে চাইছো?"

স্বপ্না সুরু করল, "শুনুন দাদা তবে বলি, আমার শ্বশুররা তিন পুরুষের বড়লোক। সম্পত্তি ভাগাভাগি হওয়ার পর আমার শ্বশুর পান নিউ আলিপুরের বসতবাড়ি ছাড়া আর দুখানা বাড়ি—যা তখন ভাড়ায় চলে। আমার ননদের বিয়ের পর একখান বাড়ি তাঁকে যৌতুক দেন। আর একখান বাড়ি তিনতলা করেন কিছু গাঁটের পয়সা খরচ করে, আর বাকিটা সেলামী বা অগ্রিম ভাড়া আদায় করে। ইনি শ্বশুরের সবেধন নীলমণি। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পর ইনি এগুলির ওয়ারিশান হয়েছেন।

"তবে আমার বিয়ের একবছর পরে বসতবাটীর অর্দ্ধেক অংশ বাবা মানে আমার শ্বশুর আমাকে উইল ক'রে দেন। আমার অংশ ভাড়া দেওয়া আছে। প্রতি মাসে ভাড়ার টাকা আমার নামেই ব্যাঙ্কে জমা পড়ে।"

পরক্ষণেই স্বপ্না রূপেনের দিকে চেয়ে বলল, "কি গো? ঠিক জমা পড়ছে তো? পাস বইটা একবার দেখতে হবে"—বলে হাসল।

রূপেন বলল, "তুমি সেই মেয়েই বটে। রোজ তো একবার করে পাসবুক উল্টে দেখ।" "বারে জয়েন্ট্ একাউন্টস্ যে, আমার সই ছাড়াও তো টাকা উঠতে পার।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তারপর?"

"মোটামুটি এখন পর্যন্ত আমাদের স্বচ্ছল অবস্থা। বুঝে চললে আমাদের ছেলেও এই সম্পত্তির মালিক হবে একদিন।"

"তোমার ছেলে হয়েছে নাকি?"

"বাবলু এই সবে পাঁচে পড়েছে।" স্বপ্নার মুখে চোখে এক অপূর্ব জ্যোতি ফুটে উঠল।

"কার কাছে বাবলুকে রেখে এসেছ ?"

"আমার বড়দির কাছে, তিনি আমাকে মানুষ ক'রেছেন।"

"কেন তোমার মা নেই ?"

"মা যখন মারা যান আমি তখন চার বছরের। বি, এ, পরীক্ষা দেওয়ার পর বড়দির বিয়ে হয়। বিয়ের দু'বছর পর জামাইবাবু মারা যান। সেই শোক মা আর সামলাতে পারলেন না।" স্বপ্না উদাস দৃষ্টিতে আকাশ ছোঁয়া বনানীর দিকে চেয়ে রইল।

"ভারি করুণ তো তোমার বড়দির জীবন। তারপর ?"

আমার দিকে চেয়ে স্বপ্না বলতে লাগল, "আই, এস, সি, পাশ করার পরই আমার বিয়ে হয়ে গেল। তখন সবে আমি আঠার বছরে পড়েছি।"

"হঠাৎ এত শীগ্‌গীর ?"

"কি জানি, বাবা কি ভেবেছিলেন সেদিন ? এঁর হয়তো একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল।" কথাটি বলে রূপেনের দিকে কটাক্ষে স্বপ্না একটু হাসল।

"কি ভেবেছিলেন তোমার বাবা ?"

"প্রেসিডেন্সীতে উনি তখন এম, এ, পড়তেন। আর বাবার স্নেহের সুযোগ নিয়ে কলেজ ফেরত আমাদের বাড়ি এসে আমার খাবারে ভাগ বসাতেন ও নানা গল্প করতেন।"

রূপেন প্রতিবাদ করে বলল, "ককৃখনো নয়। আমি তাঁর লাইব্রেরিতে পড়তে যেতাম। বড়দি খুশী হ'য়ে আমাকে খাবার খেতে দিতেন। আর তুমি এসে আমাকে খাবার জন্যে সাধাসাধি করতে।"

"আহা—আর সেদিন মশায় ? যেদিন জয়পুরী শ্বেত পাথরের রেকাবিটা আমার পায়ে পড়েছিল ?"

“সেতো আমার খাবার তুমি এনে খাচ্ছিলে।” রূপেন হেসে উঠলো।

মুখচোখ লাল করে স্বপ্না আঙুল দিয়ে রূপেনকে দেখিয়ে বলল, “তুমি নাম্বার ওয়ান মিথ্যুক।”

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে হেসে বলল, “জানেন দাদা ঠিক সেই সময় কলেজ থেকে বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন।”

আমি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম, “তারপর ?”

“আমি তখন মাগো বলে পায়ে হাত দিয়ে বসে পড়েছি।”

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, “কি হল স্বপ্না ?”

উনি ভালমানুষের মত বাবাকে বললেন, “বড়দি আমাকে খাবার খেতে দিয়েছিলেন, স্বপ্না কেড়ে খেতে গিয়ে ডিস্‌টা পায়ে ফেলেছে।”

আমি হেসে বললাম, “তারপর ?”

“বাবা ওঁর কথা বিশ্বাস করলেন। জানেন তো ভালছেলের সাত খুন মাপ। বাবা বললেন স্বপ্নাকে নিয়ে আর পারা গেল না, কোথায় তুই ওকে খাওয়াবি...”

“কোথায় লাগল দেখি ?” বড়দি হাসতে হাসতে এসে আমার হাত ধরে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন।

“তারপর ?”

“এর কিছুদিন পরেই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। উনি ভালভাবে পাশ করলেন। আমার পড়াশুনা শিকেয় উঠল।”

“কেন ? নূতন পরিস্থিতিতে পড়ে আর পড়তে ভাল লাগল না ?”

“না দাদা, ছেলেবেলা থেকেই দিদিদের মত আমার কলেজে পড়ার আগ্রহ ছিল। কিন্তু বড়দি আমার শ্বশুরকে বলে পড়া বন্ধ করিয়ে দিলেন। একদিন এসে শ্বশুরকে বললেন, “স্বপ্নার এখন সাংসারিক কাজে কিছুটা অভিজ্ঞতা দরকার। বিশেষ করে এ বাড়িতে ও ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোক নেই।”

"বাবা দিদির কথা শুনে খুশি হয়ে বললেন সন্ধ্যা মা'র কথা আমি মূল্যবান মনে করি স্বপ্না, তোমাকে তো আর চাকরি করতে হবে না, পড়তে চাও বাড়িতে পড়। রূপেন তোমাকে সাহায্য করবে। তা ছাড়া তোমার দিদি ও বাবা তো আছেনই।"

"তুমি দাদার সামনে আমার নাম করলে?" রূপেন মৃদু প্রতিবাদ করল।

"তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে? দেখ বাইরে তোমরা ক্রুশ্চভকে মুখে সমর্থন করে গলাবাজি করলেও ভিতরে মন থেকে সেই জার আমলের বুর্জোয়া ভাবধারা এখন পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারনি।"

"সাবাস স্বপ্না— চমৎকার কমপ্লিমেণ্ট দিলে তো।"

"তিন বোনের মধ্যে আমিই ছোট দাদা। বাবা ইংরাজি, দর্শন ও বাংলায় এম. এ.। প্রেসিডেন্সীর নামকরা অধ্যাপক।"

"তা হলে কি হবে? তোমার কলেজে পড়া তো বন্ধ হয়ে গেল।"

"দাদা কলেজে পড়াটাই শিক্ষার চরম সার্থকতা নয়। বাবার কাছে ছোট থেকে আমরা ছেলের মতই শিক্ষা পেয়েছি। তিনি বলেন প্রাকৃতিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবধান ছাড়া ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং মেয়েরা অপেক্ষাকৃত বেশি বুদ্ধিমতী। এটাই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। বাবার সামনে আমরা বন্ধুদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা ও যে কোন বিষয়ের আলোচনা করেছি। কোনদিন তিনি মানা করেন নি।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "বন্ধু মানে তোমাদের সহপাঠী মেয়েরা তো?"

স্বপ্না হাসির ঝিলিক তুলে বলল, "দাদা মেয়ের বন্ধু মানেই হল সে পুরুষ। আর পুরুষের বন্ধু হলে বুঝতে হবে সে নারী।"

"কথাটা কেমন যেন লাগছে, সময় মত ভেবে দেখব।"

"হ্যাঁ তা দেখবেন। বাবার মতে মেয়ে ও পুরুষে ভেদাভেদ করেই এদেশে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ভাল ও মন্দ উপলব্ধি বোধ প্রত্যেকের হাতে ছেড়ে দিতে হবে—যাতে নিজের চলার পথ সে নিজেই তৈরী ক'রে নিতে পারে।"

"বড় শক্ত কাজ স্বপ্না। অপরিণত বয়সে জলের মতই মনের গতি থাকে। তখন সে নিম্নগামি।"

"কিন্তু দাদা অভিভাবক কতক্ষণ তাঁর সন্তানের উপর পাহারা দিতে পারেন? আর যাই হোক জোর করে ছেলে মেয়ে মানুষ করা যায় না।"

"কথাটি এদিক দিয়ে ঠিক, কিন্তু—"

"কিন্তুর কি আছে? আছাড় না খেয়ে কেউ হাঁটতে শেখে না বাবার মতে ছেলেমেয়েদের ত্রুটী বিচ্যুতি ঘটবেই। সেটাকে বড় করে তোলার কি আছে? দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে তারা যেন তা থেকে বিরত থাকে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কোনদিন কাউকে টানতে পারে না। অবশ্য যদি সে সচেতন থাকে।"

"তবে কেন তাঁরা তোমার শিক্ষা বন্ধ করে দিলেন?"

"বলেছি তো বড়দি আমার কলেজ করা পছন্দ করলেন না। তার অবশ্য কারণ আছে। মেজদির ব্যবহারে বড়দি একটু ব্যথা পান। আর বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা শিক্ষার চূড়ান্ত বলে মনে করি না।"

"কেন তোমার মেজদি কি করেছিলেন?"

"ডি ও জি পাশ ক'রে হাসপাতালে চাকরী নেওয়ার পর এক মাদ্রাজী ডাক্তারের সঙ্গে মেজদির বন্ধুত্ব হয়। তাঁদের ঘনিষ্ঠতা দেখে বড়দি বিয়ের প্রস্তাব করেন কিন্তু মেজদি না বলে কথাটি এড়িয়ে যান।"

"তার কারণ?"

"মেজদির মতে যাকে ভালবাসি তাকে বিয়ে করা উচিত নয়। কারণ তাতে ভালবাসার অপমৃত্যু ঘটে। বিয়ে করা মানেই একটা

চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। যত রকমের বিয়ে আছে মূলে তার ঐ একই ব্যবস্থা। বিয়ের বাঁধাধরা নিয়মের দায়িত্ব পালনে ভালবাসা হাবুডুবু খেতে থাকে।"

"তুমি এ সব কি বলছ, কোথায় পেলে এ ভাবধারা?" রূপেন টিপ্পনী কাটল, "এখনি হয়েছে কি? ওঁর ঝুলিতে আজগুবি আরও অনেক কিছু আছে।"

"তুমি থাম তো বাপু। তোমার মন্তব্য কেউ শুনতে চায় না।"

তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, "দাদা যেন কি? একি আমার কথা? মেজদির মুখে আমি যা শুনেছি তাই আপনাকে বলছি। উনি থার্ড পারসন হ'য়ে ভাইবোনের কথায় নাক গলাতে এলে আলোচনার রস ভঙ্গ হয়। ও আমার পছন্দ না।"

আমি হেসে বললাম, "ভারি অন্যায় রূপেনের। একে ভাইবোনের কথা, তাতে জোর ক'রে থার্ড পারসনের কিছু বলা, ভারি অন্যায়। তুমি কাহিনী শেষ কর—তারপর?"

"মনের মিলনই ভালবাসার উৎস। তাকে সঞ্জীবিত রাখতে হলে সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তুলতে হয়। প্রতিদিন সোহাগ সিঞ্চনের বারিধারায় যাতে সে সুপুষ্ট ও সুগঠিত হয়, তারজন্য চাই উভয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা। বিয়ের বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে পড়ে সে যেন সংসার মরুপথে অকালে না হারিয়ে যায়। অমৃতের বদলে সেখানে যেন গরল না ওঠে।"

"ছেড়ে দাও ওসব বড় বড় কথা। এবার তোমার কথা বল।"

স্বপ্না বলে চলল, "ওঁর সাহচর্যে কিছুদিন পড়াশুনা চলেছিল। তারপর উনি ছবি আঁকায় এমন মত্ত হ'য়ে পড়লেন যে আমি আর পাত্তা পেলাম না।"

"কি রকম? একটু খুলে না বললে সঠিক কল্পনায় আসবে না।"

এক ঝলক হাসির সাথে রূপেনের দিকে কটাক্ষ করে স্বপ্না সুরু

করল, "সে কি মহামারী ব্যাপার ? জার্মান ও উইণ্ডক্যাসেল থেকে রঙ। প্যারি থেকে তুলি ও কাগজ। হংকং ও টোকিও-ও বাদ পড়ল না। আমাকে সামনে বসিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাগজের উপর তুলি দিয়ে বিচিত্র রঙের রেখা টানা চলতে লাগল।"

"বাঃ, একেবারে টিপিক্যাল শিল্পী ?"

"শিল্পী বলে শিল্পী ? শুনুন না তারপর। এইভাবে কিছুদিন চলার পর আমার ত একদিন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। বিরক্ত হ'য়ে উঠে কাপড় পরতে সুরু করলাম।

"উনি তাড়াতাড়ি উঠে 'লক্ষ্মীটি আর একটু বস' বলে আঁচল ধরতেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'দেখ আমি ভদ্রঘরের মেয়ে, শিল্পীর মডেলগিরি করবার জন্য বাবা আমার বিয়ে দেন নি। তুমি অন্য রাস্তা দেখ।"

"তারপর ?"

রূপেন জবাব দিল, "তারপর আর কি ? ঐ রকম কঠোর কথা শুনে আমার হাতের মুঠো আপনিই আলগা হ'য়ে গেল।"

স্বপ্না সলাজ হাসি মুখে নিয়ে বলল, "দাদা সব মেয়েরাই স্বামীর ভালবাসা চায়। তার সঙ্গে কিছু আদর ও সোহাগ। কিন্তু তাই বলে কোন স্বামী হ্যাংলার মত দিনরাত সব সময় পিছনে ঘুরপাক খাক, অন্ততঃ আমি এ রকম চাই না।"

আমি বললাম, "দেখ ভালবাসার তো এখন পর্যন্ত কোন যন্ত্র আবিষ্কার হয় নি ? বিয়ের পর প্রথম প্রথম ওরকম একটু হয়ে থাকে। ওটা তো দুদিনের --"

"আমার অবস্থাটা একটু ভেবে দেখুন, দাদা। আমার তখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' গোছের অবস্থা। আমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা উপশিরা, নাড়ী নক্ষত্র থেকে লোমকূপ পর্যন্ত নব মাতৃত্বের রূপ, রস ও সৌন্দর্য নিয়ে প্রকৃতিদেবী থরে

ধরে ভরিয়ে দিচ্ছেন। আর সেই ভারে আমিও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত।”

“আরে শিল্পী যে ঐ পরম মুহূর্তের জন্য যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষা ক’রে তার তুলি নিয়ে বসে থাকে। প্রথম মা হবার কয়েকমাস পূর্বে নারী যে সীমাহীন সৌন্দর্যে রূপায়িত হয়। শিল্পীর চোখে তখন ধাঁধাঁ লাগে।”

স্বপ্না হেসে বলল, “এবারে দাদার কবিত্ব শুরু হল।”

রূপেন প্রতিবাদ করে বলল, “দাদা ঠিক কথাই বলেছেন। তিনি মোটেই তোমার কাছে কবিত্ব করছেন না।” “তুমি খামো তো বাপু” —কথাটা বলেই স্বপ্না হেসে ফেলল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে স্বপ্না বলল, “কিন্তু দাদা তখন আমি নিজেই স্বপ্নের আবেশে ভেসে চলেছি দিনরাত। কারুর সঙ্গই তখন আমার ভাল লাগত না। অবশ্য উনি আর আমায় বিরক্ত করেন নি। আমি মনে ক’রলাম ফাঁড়া বুঝি কেটে গেল।”

“কিন্তু দেখলে এত সহজে ফাঁড়া কাটল না,—কেমন?”

“হ্যাঁ দাদা ঠিক তাই।”

“কি হ’ল তারপর?”

“এর ঠিক এক বছর পরে হঠাৎ একদিন বড়দি এসে আমার ঘরে ঢুকলেন। তাঁর মুখ দেখেই বুঝলাম একটা অঘটন হ’য়েছে। কোন ভূমিকা না করেই তিনি বললেন—‘স্বপ্না রূপেনের কাছ থেকে এ ব্যবহার তো আমি কোনদিন প্রত্যাশা করি নি। হাজার হোক বাইরে আমাদের একটা নাম ডাক আছে। ছবি আঁকা শিখতে হ’লে প্যারি কিংবা পিকিং-এ চলে যাও। কোন ভাল শিল্পীর স্টুডিওতে ভর্তি হ’তে পার। তা নয়, মানসম্ভ্রম খুইয়ে শিয়ালদহ ষ্টেশনে উদ্বাস্তুদের নিয়ে স্কেচ্ আঁকা, এ কি শালিনতা বিরুদ্ধ নয়?”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “কার কাছে শুনলে এসব তুমি?”

“ওমা, শুনব আবার কার কাছে? নিজের চোখে দেখে এলাম

যে। বাবলুর জন্য দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী পূজো দিতে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় দেখে এলাম শুধু উনি একা নন, হবু শিল্পীরা অনেকেই এ সুযোগ নিয়েছেন। উদ্বাস্তুরা জন্মের মত নিজেদের ভিটেমাটি খুইয়ে ষ্টেশনে পশুর অধম জীবন যাপন করছে। ওদের আর কোন সত্তা নেই বোন। তাই বলে আমরাও কি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হানব?"

চলে যাবার সময় বড়দি আমাকে কোলের কাছে টেনে আদর করে বললেন, "একটা মিষ্টি কথা লক্ষ কড়া কথার চেয়ে মূল্যবান বোন, এ কথা যেন সব সময় মনে থাকে। রূপেনের উপর তুই যেন রূঢ় ব্যবহার করিস নে। ভালভাবে বললে শিক্ষিত ছেলে নিজের ভুল শুধরে নেবে।"

"আমি বললাম তারপর তুমি কি করলে?"

"বড়দি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন আমার সারা অঙ্গে আগুন ধরিয়ে দিল। সত্যই তো বেচারীরা সর্বস্ব খুইয়ে আজ পথে বসেছে। তাদের সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাদের নিয়ে একি মর্মান্তিক পরিহাস?

"বড়দি যাই বলুন বাবার কথা আমার মনে পড়ল। যে পূজার যে মন্ত্র। শক্তি পূজায় তাই রুধির ও রক্তজবার প্রয়োজন। শক্তির দ্বারাই শক্তিকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়।

"ঠিক সেই সময় উনি এসে ঘরে ঢুকলেন। আমি তখন রাগে আত্মহারা। প্রথমেই আমি স্বরু করলাম, বল—মানুষ কতখানি নামলে এই রকম হৃদয়হীনতার পরিচয় দিতে পারে?"

রূপেন বলল, "জানেন দাদা, আমি তো ওঁর রকম সকম দেখে আকাশ থেকে পড়লাম। কি করলাম রে বাবা?"

আমি হেসে বললাম, "তারপর স্বপ্না?"

"রাগে আমি তখন আমার বোধশক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি।

চীৎকার ক'রে ওঁর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'বল, আমার কথার জবার দাও ?"

আমি বললাম, "তারপর ?"

স্বপ্না তার দুই হাতের চেটোর উপর চিবুক রেখে চোখ বুজে বলল, "দাদা আর আমার কিছু মনে নেই।"

রূপেন উত্তেজিত হয়ে এবার বলল, "ইস্ বলতে হবে তোমাকে। মনে নেই ? সব মনে আছে। জানেন দাদা, আমার এত দামের রং তুলি, কাগজ পত্র সব ড্রয়ার থেকে বের করে উপর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে নীচের ড্রেনে ফেলে দিয়ে বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

"তারপর তাঁর কাছে ওকে মডেলগিরি করান থেকে শুরু করে উদ্বাস্তুদের নিয়ে স্কেচ্ আঁকা পর্যন্ত সব ইনিয়ে বিনিয়ে ব্যক্ত করল।"

"এবার মনে পড়েছে"—বলে রূপেনের গা ঘেঁষে বসে ওর মুখে হাত দিয়ে চাপা দিল। আমি স্বপ্নার ছেলেমানুষি দেখে হেসে ফেললাম, রূপেনও হাসছে। স্বপ্নাকে বললাম, "আচ্ছা তুমিই বল।"

স্বপ্না আবার বলতে সুরু করল, "বাবা আমাকে সত্যই খুব স্নেহ করতেন। সব শুনে আমার মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, "তোমার এ কাজে আমি খুব খুশী হ'য়েছি স্বপ্না। স্বামীর যেমন স্ত্রীকে কোন অন্যায় কাজ করলে শাসন করবার অধিকার আছে, স্ত্রীর কর্তব্যও তদ্রূপ। তার অধিকার তার চেয়ে একচুলও কম নয়। আদর্শ স্ত্রী হ'তে হ'লে সব সময় হিসাবে কঠিন ও নির্মম হতে হয়। এরপরের ব্যবস্থা তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও। এখন আর ওকে কিছু বল না।"

রূপেন স্বপ্নাকে দেখিয়ে বলল, "জানেন দাদা ? ও একটি বিচ্ছু।"

"আহা—নিজে যে কুটুস্ কামড় কাঠপিঁপ্ড়ে।"

স্বপ্নার জবাব শুনে আমি হো হো করে হেসে উঠলাম, ওরাও তাতে যোগ দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বপ্নার কাহিনী এখনও শেষ হয় নি, সে আবার আরম্ভ করল, "এর এক সপ্তাহ পরে প্রফেসার কাকু আমাদের বাড়িতে এলেন। উনি বিদ্যাসাগরের অধ্যাপক। লেখক ও সুবক্তা। বাবা ও শ্বশুর-মহাশয়ের অকৃত্রিম বন্ধু। একসময় উনি এঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন। সকলের সঙ্গেই বন্ধুর মত ব্যবহার করেন। আর সব সময় সকলকে সরস গল্পে জমিয়ে রাখেন। আমাকে দেখে বললেন, "কি গো মা লক্ষ্মী, কর্তাটি গেলেন কোথায় ?"

আমি তাঁকে প্রণাম করে বললাম, "কি জানি কাকু আমি কারো খোঁজখবর রাখি নে।" এমন সময় উনি ঘর থেকে বেরিয়ে কাকুকে প্রণাম করলেন। কাকু হাসি মুখে আমার মাথা নাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "দিব্যি তো দুটিতে মাণিকজোড় হ'য়ে ঘরে ছিলে এতক্ষণ, অথচ আমাকে দিব্যি একটা গুল ঝাড়লে। আমি তখনই বুঝেছি— বুড়ো শ্বশুর পেয়ে স্বপ্না শ্রেফ্ ভাঁওতা দিয়েছে।"

"আমি হেসে বললাম, "কাকু বোধহয় আমাদের কাকীমাকে খুব ভাঁওতা দিতেন ?"

তিনি বললেন, "নারে বেটী তখনকার দিনে দিনেরবেলায় স্বামী-স্ত্রীর ঠিক ভাসুর ভাদ্র-বৌয়ের সম্পর্ক ছিল ?"

"আর এখন ?"

"সে তো চোখের সামনে জাজ্বল্যমান। স্রেফ্ কমরেড। চকা-চকীর মত গলাগলি করতেও ছাড়ে না। আবার পান থেকে চুণ খসলে—, মালেনকভ বা বুলগানিনের মত পার্টি থেকে সরিয়ে বনবাস দিতেও বাধে না।"

হাসি চেপে বললাম, "কি জানি কাকু আমি অতশত বুঝি নে।"

"না তুমি ভালমানুষের বেটী ভালমানুষ। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জান না? একসঙ্গে এলোপ্যাথির সেরা দাওয়াইগুলি ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন্, ক্লোরোমাইসিটিন ও পেনিসিলিন মোক্ষম ভাবে ঝেড়েছে। বাবাজী আমার হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন।" কথাটি বলে ওঁর কাঁধে হাত রাখলেন। উনি তাঁর কথা বলার ভঙ্গিমায় হাসছেন। আর আমি আমার মুখের মধ্যে ক্রমাগত আঁচল গুঁজে হাসি চাপতে না পেরে মেঝেতে বসে লুটোপুটি খাচ্ছি।"

স্বপ্নার কথা বলার ভঙ্গিমায় আমরাও হেসে ফেললাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "তারপর?"

স্বপ্না বলল, "নিজেকে একটু সামলে নিয়ে, আমি কাকুকে উল্টো চাপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আর কাকীমা আপনাকে কি রকম দাওয়াই দিতেন?"

"আমাদের কালে সাম্যভাব এ দেশেই ছিল না। আমি যা খুশি করেছি। তিনিও 'পতি পরম গুরু' বলে মাথা পেতে নিয়েছেন। বিশেষ কিছু হলে হোমিওপ্যাথি 'নাক্স' দিয়েছেন এক ডোজ। অর্থাৎ স্রেফ টপ্ টপ্ করে চোখের জল ফেলেছেন।"

"আহা, যা তা আমাকে বললেই হল নাকি? কাকীমা তো শিক্ষিতা মহিলা।"

"আরে শিক্ষিতা হ'লে কি হবে? তখনকার দিনে ঐটাই ছিল তাঁদের ব্রহ্মাস্ত্র।"

"আমি কাকীমাকে সব বলে দেব।"

"বেশ তা দিও। এখন চল তোমার শ্বশুরের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।"

"বাবা এখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি, আসুন আমাদের ঘরে বসে গল্প করবেন।"

"দেখ বাপু, শুধু মুখে গল্প জমবে না।"

"বলুন চায়ের সঙ্গে আর কি দেব? চপ্ টপ্?"

"উঁহু, শ্রেফ্ পান হলেই চলবে।"

আমরা ঘরে এসে বসলে, চাকর চায়ের সরঞ্জাম রেখে পান আনতে গেল। কাকু সুরু করলেন,

"আমার অতীতের একটা ঘটনা বলি—মন দিয়ে শোন। তখন আমি বঙ্গবাসীর লেকচারার আর রূপেনের গৃহশিক্ষক। চাকুরী মনঃপুত নয়, সে তো বুঝতেই পারছ। বিকেলে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ কলেজ ষ্ট্রীটে বন্ধু ভবানীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে তখন আর্টিষ্ট হিসাবে বাজারে বেশ নাম করেছে। আমার হাত ধরে বলল, 'অনেকদিন পর দেখা, চল অতুল কোথাও বসে একটু গল্প করিগে।' সামনেই দিল্‌খুস, দুই বন্ধুতে ঢুকে পড়লাম। চা ও ডবল ওমলেট ফরমাস দিয়ে ভবানী সিগারেট ধরাল। অনেক সুখ দুঃখের গল্পের সাথে চা খাওয়া শেষ হল। তারপর আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ভবানী বলল 'দেখ্ ক্রমাগত পাঁচবছর একটানা পরিশ্রম করে আজ বাজারে আমাকে শিল্পী বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। ছবির দুতিনটি প্রদর্শনী দেখিয়ে নাম করেছি। এখন বেশ দু পয়সা রোজগার হচ্ছে। বাড়িতে এসে লোক আগ্রহভরে ছবি নিয়ে যায়।

"তুই এক কাজ কর। উপন্যাস লিখতে সুরু করে দে। দু পয়সা উপার্জন করতে পারবি।'

"আমি বললাম, তা হ'লেই হয়েছে। তুইও যেমন—লেখক হওয়া কি এতই সহজ নাকি?

"সহজ বা শক্তর কথা তো আমি বলি নি। আমরা জানি যে, কোন্ জিনিস লেখার তোর একটা ন্যাক্ আছে। শেলী, বায়রণ, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, সেক্সপীয়র থেকে সুরু করে বাংলার বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথ যায় বটতলার উপন্যাসও তুই পড়তে বাদ দিস নি। একটু চেষ্টা করলে বাজারে তোর নাম করা কঠিন হবে না। তা ছাড়া আজকাল বাজারে নামকরা লেখকের বই খুব কমই বার হয়।"

"আমি বললাম, দেখ্ লেখার মত কিছু লিখতে হলে কিছুটা বাস্তব জ্ঞানের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। বিশেষ করে মেয়েদের সম্বন্ধে। তোরা তবু বিয়ে থা করেছিস, তোদের অন্ততঃ একটা নারীরও অভিজ্ঞতা আছে, আমি তো সে রসেও বঞ্চিত।'

"ভবানী হো হো করে হেসে বলল, 'একটা বিয়ে করলেই বুঝি রাতারাতি স্ত্রী বিশেষজ্ঞ হয়ে যায়? কে বলেছে শুনি? তুইও যেমন? বিবাহিত লোকেরা নারীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বরং কিছুই বোঝেন না। পাঁচটা মডেল নাড়াচাড়া করে এখন আমার তাদের সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে বলতে পারি। আর তোর সে সবের প্রয়োজন কি? আমার কয়েকটি কথা মন দিয়ে শুনে কাজে নেমে পড়। তারপর একটু ভেবে চিন্তে খুশিমত নিজের কর্মপন্থা ঠিক করে নিবি। তবে ফলাফল সব সময় বিশ্ব নিয়ন্তার হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। পুরুষকার যতই থাক্, ওখানে মানুষের হাত নেই।'

"বেশ বল, আমি সব কথাই মন দিয়ে শুনছি।'

"ভবানী আর একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সুরু করল,

"মানুষ কয়েকটি সহজাত বুদ্ধি ও গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে। তার মধ্যে একটি হল শিল্পী মন। চর্চা ও পরিবেশের মাধ্যমে শিল্পীর প্রতিভা বিকাশ হয়। নচেৎ চাপা পড়ে যায় চিরতরে। চৌষট্টি কলার মধ্যে চিত্রাঙ্কণ একটি। সেই রকম নৃত্য, গীত, বাদ্য

অভিনয়, স্থাপত্য, কথকতা প্রভৃতি ঐ শিল্পীমনেরই এক একটি দিক বা উৎস। বাহ্যিক পার্থক্য থাকলেও অন্তর দৃষ্টিতে কিন্তু সবগুলি অভিন্ন। অন্তরে কল্পনার রাজ্যে উর্মিমালা দোলা দিচ্ছে নিয়ত।

"তবে দেশ কাল সময় বুঝে শিল্পী প্রকাশ ভঙ্গির রূপ পরিবর্তন করে। ভাবধারা ও ভাষার পার্থক্য দেখা যায় যুগে যুগে। অর্থ রোজগারের জন্য অবশ্য বৈষয়িক বুদ্ধির প্রয়োজন। কি ধরণের বই বাজারে চাহিদা—তার জন্য থাকবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সব সময়।

"আমি রং তুলির মাধ্যমে রেখার দ্বারা যে আলেখ্য সৃষ্টি করি, তোকে কালি ও কলমের সাহায্যে, ভাষার মাধ্যমে রূপ, রস ও মাধুর্যে ভরিয়ে রম্য এক রচনা সৃষ্টি করতে হবে উপন্যাসে। সৃজনকারই কাজ মিথ্যার বেসাতি নিয়ে। যেটা নেই, সচরাচর ঘটে না কল্পনার সাহায্যে মন থেকে গ'ড়ে তুলতে হবে সেই স্বপ্ন সৌধ।

"বর্ণ বিন্যাসের দ্বারা নানান রঙিন জারকে রূপ ও রস দিয়ে ভরিয়ে স্বপ্নের মোহময় জাল বুনে দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে হবে। হয়তো একটু অশ্লীলতা প্রকাশ পাবে, উপায় নেই, ওইটাই আদি রস। তবে একেবারে নগ্নতা প্রকাশ না করে শালীনতার জন্য সব সময় মার্জিত ভাষা দ্বারা অন্ততঃ ফিন্‌ফিনে একটা আবরণ জড়িয়ে দিবি।'

"আমি বললাম, 'ভবানী তোর কথা আমার কিছু কিছু মনে লাগছে।'

"কোন নামকরা লেখকের বই পড়ে আমি সে জায়গাটা বেড়াতে গিয়ে নিরাশ হয়েছি। বাস্তবের সঙ্গে তাঁর বর্ণনার কোন মিল নেই।'

"ভাবানী হো হো করে হেসে বলল, 'বলেছি তো উপন্যাস ইতিহাস নয়। কিংবা খবরের কাগজের ষ্টাফ্ রিপোর্টও নয়। লেখার সঙ্গে বাস্তবের মিল থাকতে পারে না। নায়ক নায়িকার

চরিত্র নানান উজ্জ্বলতার আদর্শবাদে ভরিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে হয়। যার নাগাল কেউ কোনদিনই পাবে না।

"বাজারে যত ছবি বিক্রী হচ্ছে তার কোন একটি ছবির সঙ্গে বাস্তবে হুবহু কারো মিল আছে কি? কিছুটা থাকতে পারে, কিন্তু ছবিগুলি অঙ্গভঙ্গির দ্বারা এমন বিন্যাসের মাধুর্য ভরিয়ে আঁকা যে, লোকে ছবি জেনেও বার বার চেয়ে দেখে ও কিনে নিয়ে যায়। এমনই তার আকর্ষণ।

"যে কোন চরিত্রকে বিভিন্ন রুচির উপাদানে ভরিয়ে সৌন্দর্যে-লালিত্যে সুষ্ঠুভাবে সাধারণের সামনে অসাধারণভাবে তুলে ধরাই সাহিত্যিকের পরিচয়। চাঁদের মত মুখ ও মেঘের মত চুল কারো হয় না। ওটা এক্‌টা উপমা। 'শুষ্কং কাষ্ঠং' না লিখে তোমাকে নীরস তরুবর লিখতে হবে। এই যে মোহন সিরিজ--বাজারে পড়তে পায় না। মিথ্যা জেনেও ভাল লাগে বলে লোকে কিনে পড়ে।

"ছবিতে নরনারীর সৌন্দর্যপ্রিয় স্থানগুলি আমরা যেমন বর্ণ ফুটিয়ে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, গায়ক যেমন তান তুলে মীড় মূর্ছনা প্রভৃতির দ্বারা শ্রোতাকে সুরপ্রবাহে ভাসিয়ে দেয়, তোকেও ঠিক সেইভাবে ভাষার শব্দ-বিন্যাসে বর্ণনার দ্বারা পাঠকের মনে শিহরণ বা ভাবোচ্ছাসের বন্যার মধ্যে ঢেউ তুলতে হবে। বই পড়তে পড়তে দৃশ্যগুলি যেন পরিষ্কার সামনে ভেসে উঠে মুগ্ধ করে দেয়।"

এতক্ষণ পর আমি বললাম, "স্বপ্না তোমার মুখ থেকে তোমার কাকাবাবুর কথাগুলি শুনতে ভারি মিষ্টি লাগছে।"

রূপেন বলল, "স্বপ্নার প্রধান বিশেষত্ব ও ঠিক কাকাবাবুর মতই পোজ নিয়ে ওর নিজস্ব ভঙ্গিমায় কথাগুলি বলে চলেছে।"

"আহা তুমি থাম তো?"—কথাক'টি বলেই স্বপ্না হেসে ফেলল। তার গালে টোল খেয়ে মুখ চোখ উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে।

স্বপ্না আবার বলতে সুরু করল, "কাকাবাবু আমাদের দিকে

তাকিয়ে আবার বললেন, তোমাদের কাছে আমার এ গল্প বলার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছ?" আমরা দু'জনেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

"কি বুঝলে রূপেন?"

"এখন থেকে আমি বই লেখার চেষ্টা করব কাকাবাবু।"

"আর স্বপ্না তুমি?"

"কাকাবাবু আমি আমার সাধ্যমত ওঁকে সাহায্য করব!"

"গুড্ গুড্, ভেরী গুড্। এবার আমি এ সম্বন্ধে আর দু একটি কথা বলে প্রসঙ্গ শেষ করি। সৎগুরুর মত ভবানী মাত্র কয়েকটি মিনিটে তার অভিজ্ঞতার মূল্যবান সারমর্ম প্রকাশ করে উঠে পড়ল। যাতে করে তাকে আর আমার কোনদিনই প্রয়োজন না হয়। আমার অভিজ্ঞতাও সেইভাবে তোমাদের কাছে সম্পূর্ণ প্রকাশ করে দিতে চাই। যাতে আর অনর্থক আমার কাছে তোমাদের দৌড়তে না হয়।"

"কাকাবাবুর কথা তখনও সব বলা হয় নি, একসঙ্গে দুটো পান ও কিছু চূণ মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে তিনি আবার বলে চললেন, 'আমাদের যুগ শেষ হয়েছে। মা, দিদি, বিপ্রদাস প্রভৃতি নামকরণ আর এ যুগে চলবে না। প্লট যাই হোক, উপরে নামের চটক-চাই।'

"আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নাম দেওয়া সম্বন্ধে একটু আভাস দিন।—তিনি বললেন, 'যেমন ধর 'আগুন নিয়ে খেলা', 'রম্যানি বীক্ষ্য' 'বহ্নিবন্যা' প্রভৃতি যা আজকালকার নামকরা লেখকেরা দিয়ে থাকেন। আর একটি কথা— ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার চরম পরীক্ষা চলবে প্রতি পদক্ষেপে। যাঁদের আক্ষরিক পরিচয় হয়নি তাঁরাও বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা করছেন।"

উনি এবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কাকাবাবু কোন লেখা শেষ হলে

আপনার সঙ্গে সমালোচনার সময়—ধরুন কোন ডেলিকেট্ টক্''—ওঁকে বাধা দিয়ে হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। আমি লজ্জায় মাথা নীচু করলাম।

"কাকাবাবু বললেন, স্বপ্না তোমাদের দুজনকেই আমি আমার সন্তানের মত স্নেহ করি। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রম্ মিত্রম্ বদাচরেৎ' এই শাস্ত্রবাক্যটির মূল্য আছে। তুমি এখন মা হ'য়েছ। জন্মরহস্য এখন আর তোমাদের অজানা নয়। সুতরাং যে কোন বিষয় নিয়েই তোমরা আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারবে। বিবাহিত জীবন যাপন করার পর আমার ছেলে বা মেয়েরা যদি কিছু শিখবার আগ্রহ নিয়ে আমার কাছে এসে আলোচনা করে, আমি তাদের ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেব না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা তাদের প্রশ্নের জবাব দেব।"

"ওদিকে ঘুম থেকে উঠে বাবা ডাক দিলেন, অতুল কখন এলে? যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও।'

"কাকাবাবু তৈরী ছিলেন, 'এই যাই' বলে বাবার ঘরে চলে গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঝপ্পা স্কার্ফ সরিয়ে তার ব্লাউজের ভেতর থেকে হীরে ও পান্না বসান একটি পেন্‌ডেন্ট বার করে দেখাল। তারপর বলল, "কাকাবাবু চলে গেলে সেদিন সন্ধ্যাবেলা বারোশো টাকা দিয়ে বাবা আমাকে এটা কিনে দেন। বাবার শেষ আশীর্বাদ আমি কাছ ছাড়া করেনি কোন দিন।" স্বপ্নার শেষ কথাগুলি ভারি হয়ে এল।

রূপেন বলল, "জানেন দাদা সেই কথায় আছে না কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ।"

স্বপ্না তার বড় বড় চোখে রূপেনের দিকে চেয়ে বলল, "সেদিন তোমারও তো কিছু অলাভ হয়নি। দেখ মানুষ নিজের ছেলেমেয়ের চাইতে পুত্রবধূ বা জামাইকে কখনও ভালবাসতে পারে না।"

আমার দিকে ফিরে স্বপ্না বলল, "জানেন দাদা? উনি সেই দোকানে দাঁড়িয়েই বললেন বাবা আমাকে কি দেবেন?" বাবা হেসে বললেন, 'তুমি স্বপ্নার কাছে ঘোড়ের চালে বাজিমাৎ হ'য়ে গেছ। তবু আমি তোমাকে দু'হাজার টাকা দেব। তোমরা সেই টাকায় দাক্ষিণাত্য, রাজস্থান ও কাশ্মীর বেড়িয়ে আসবে। দেশ-ভ্রমণ করলে বই লেখার অনেক উপাদান পাবে ও অভিজ্ঞতা বাড়বে।'

"সেই টাকাতেই তো আমরা বেড়াতে এসেছি। বাবা আজ

আর বেঁচে নেই। তবে একটা সান্ত্বনা—বাবা ওঁর লেখা গল্পের বই কয়েকখানা দেখে গেছেন।"

"কি কি গল্পের বই লিখেছ? কই তোমার নাম তো শুনেছি বলে মনে পড়ছে না।"

স্বপ্না হাসি চেপে বলল, "কেমন করে শুনবেন— ছদ্মনাম যে! নাম নিয়েছেন 'বাস্তুহারা'।"

"ও তাই নাকি? ক'টা গল্পের বই লিখলে? উপন্যাস কবে লিখবে?" রূপেন জবাব দিল, "কাকাবাবু, প্রথমটা ছোটগল্পের উপরই জোর দিয়েছিলেন। বাজারে নামটা একটু চালু হ'লে তখন উপন্যাস সুরু করব।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "স্বপ্না তুমি ক'টা গল্প লিখেছ?"

"দাদা আমি এখন পর্যন্ত কিছু লিখি নি, তবে ওঁর লেখাগুলি মন দিয়ে পড়ি ও বই-এর নামগুলি আমিই সব ঠিক ক'রে দিয়েছি।"

"বল বই-এর কি কি নাম তুমি ঠিক করে দিয়েছ।"

"'বৌ কথা ক' পাখী', 'মায়া কাজল আঁখি', "আকাশ জোড়া পথ', 'দেখন হাসির দেশ', 'অচিন দেশের বুলবুল', 'চূনা গলির জোড়া থাম' ও 'সাগর পারের নাইয়া'—এই সাতখানি বই বাজারে বার হয়েছে।"

"গল্পের বই-এর নামগুলি তো ভালই হয়েছে। একটা নূতনত্ব আছে। কিন্তু লেখকের নাম ওরকম খাপছাড়া হ'ল কেন?"

"সেটা দাদা উনি জোর করে নিয়েছেন! বললেন উদ্বাস্তুদের জন্যই যত গণ্ডগোল। আমার আবাল্য ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিয়ে ভিন্ন পথে নূতন করে যাত্রা সুরু—উদ্বাস্তুদের সামিল।"

আমি হেসে বললাম, "এটা তোমার উপর রাগ ক'রে ঝালঝাড়া ছাড়া আর কিছু নয়।"

"ঠিক বলেছেন দাদা, আমি সে কথা বহুদিন ওঁকে বলেছি। কিন্তু

উনি স্বীকার করেন নি আমার কাছে।" রূপেন বলল, "একে মা মনসা—দাদা আবার তাতে ধূনোর গন্ধ শোঁকালেন।"

"সেটা নিজে মশায়—আমি নই। আজকে দাদার কথায় সেটা প্রমাণ হ'য়ে গেল।"

বাসের ঘন ঘন হর্ণ শুনে আমরা উঠে পড়লাম। সকলে এসে বাসে উঠতেই বাস ছেড়ে দিল। সীটে বসার সঙ্গে সঙ্গেই কানে এলো, "আজ বেঁচে থাকলে নেতাজী সারা ভারতের 'ফুয়ার' হতেন।"

বজ্রগম্ভীর স্বরে পিছন থেকে এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "সমগ্র এশিয়ার ফুয়ার বলুন। সেইবার কাউন্সিল ইলেকসন্ নিয়েই তো চিত্তরঞ্জনের কাছে গান্ধিজী ভেস্তে গিয়েছিলেন।" তাঁর গোঁফের ফাঁক দিয়ে ক্রূর হাসি দেখা দিল।

বৃদ্ধ এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তিনি আবার মুখ খুললেন। আক্ষেপের সুরে বললেন, "বাঙালী এক অভিশপ্ত জাতি। সল্লায়ু নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। নেতাজীর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে মন্ত্রপূত জয়হিন্দ্ বাণী শুনে সমগ্র পূর্ব এশিয়ার লোক সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল তা সত্যই বিস্ময়কর।"

বৃদ্ধ সোজা হয়ে বসে বলে চললেন, "কংগ্রেস হাইকমাণ্ড ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে স্বাধীনতা পেলেন। জাতিকে চিরতরে ভিক্ষুকে পরিণত করেও আশ মিটলো না। আবার একটুক্রো কেটে পাকিস্তানকে নজরানা দিতে হবে।"

"অপরের সম্পত্তি দান করতে তো নিজের পকেটে হাত পড়ে না। অথচ নাম কেনা যায়।" প্রৌঢ় টিট্কারি দিয়ে কথাটি বললেন।

বৃদ্ধ বললেন, "নেতাজীর মৃত্যুতে বাংলার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। প্রাণটুকু ধুক্ধুক্ করছিল,—শ্যামাপ্রসাদের বিয়োগে তাও শেষ হয়ে গেছে। বাংলার শশ্মানে এখন তো ভূতের নৃত্য। মানুষের মত

কটা মানুষ বেঁচে থাকলে আজই বেরুবাড়ি উপঢৌকন দেওয়া বন্ধ রে দিত।"

সামনে থেকে এক যুবক বললেন, "কেন ডাঃ রায় কমতি কিসে?" বার প্রৌঢ় বললেন, "সাপও মরে আর লাঠিও না ভাঙ্গে, উনি ই দু'মুখো নীতি আঁকড়ে রইলেন। পণ্ডিতজীও খুশী রইলেন আবার বিধানসভায় খুব হাঁক ডাক ছেড়ে সরগরম করা হ'ল। দেশের অঙ্গচ্ছেদের সময় এ নীতি অচল!"

যুবক বললেন,' কিন্তু সেণ্ট্রালের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে লাভ কি বলুন?"

প্রৌঢ় উষ্ণ হ'য়ে বললেন, "দেখুন এটা কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় যে লাভ বা ক্ষতির বিচার হবে? কৈ দিন তো পণ্ডিতজী উত্তর প্রদেশের সমপরিমাণ জমি বিহারকে? আর বিহার থেকে কেটে সেই পরিমাণ জমি বাংলাকে?"

যুবক আর কোন উত্তর করলেন না।

প্রৌঢ় নরম হয়ে বললেন, "দেখুন আপনার অল্প বয়স! সত্য কথা মাঝে মাঝে অপ্রিয় হয় জানে সকলে, কিন্তু এ নীতি নিয়ে ডাক্তারী চাললেও রাজনীতি অচল। বিশেষ করে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীত্ব।"

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ পরে আবার মুখ খুললেন, "জানি বাংলার আকাশে এখন ডাঃ রায়ই একমাত্র জ্যোতিষ্ক—যিনি স্বীয় প্রতিভাবলে জ্বলজ্বল করছেন? সারা এশিয়ার অদ্বিতীয় চিকিৎসক। রাজনীতি ক্ষেত্রেই উনিই বাংলার সাঁজতারা হয়ে উদিত হন, আবার ভোরে প্রভাতী তারায় ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিচরণ করছেন। কিন্তু আমার ইয়ং ফ্রেণ্ড একটা চলতি কথা আছে, সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে আঙ্গুল বাঁকাতে হয়!

"বাংলার অঙ্গচ্ছেদ কেন্দ্রকে আমরা কোনমতেই করতে দেব না বলে কেন্দ্রের প্রতিবাদ স্বরূপ মুখ্যমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে ওঁর বিধানসভা কক্ষ ছেড়ে বার হ'য়ে আসা উচিত ছিল! তাহলেই দেখতে

পেন্তেন সমস্ত বামপন্থীদল ডাঃ রায়কে মাথায় তুলে নাচত। সে দৃশ্যে দিল্লীর মসনদ্ প্রকম্পিত হ'ত। আর শক্রের ভক্ত ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিতজী ও তাঁর সুখী পরিবারের হৃদ্‌কম্প সুরু হ'য়ে সুবুদ্ধির উদয় হ'ত। তাঁরা ভিন্ন পথে পাকিস্তানী তোষণের ব্যবস্থা করতেন।"

চারদিক থেকে সকলে বৃদ্ধের দূরদর্শিতা সমর্থন করলেন।

সহসা বৃদ্ধের আলোচনায় বাধা পড়ল, তীব্রগতিতে বাস চড়াই উৎরাইয়ে ওঠানামা সুরু করেছে। কখনও গতি হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে সংকীর্ণ বাঁকে মোড় ফিরছে। যেমন সংকীর্ণ পথ, তেমনি পথের পাশে ভয়াবহ গভীর খাদ। বন্যায় বিধ্বস্ত নদীর পুলগুলি এ পর্যন্ত তৈরী হয় নি। বড় বড় গাছের গুঁড়ি দিয়ে সাময়িকভাবে কোন রকমে বাস চলাচল চালু আছে। সেতুগুলির পাশে না আছে রেলিং, আর রাস্তার উপর না পড়ছে পীচ? অপরিসর রাস্তার বাঁকে মোড় ঘুরবার সময় চালক ও যাত্রীরা ভয়ে শিউরে উঠছে। আমাদের বাসে সামনে ও পিছনের যাত্রীরা বমি সুরু করছেন। সামনে এক মহিলার অবস্থা অল্পক্ষণেই ভয়াবহ হ'য়ে উঠল। তাঁর পেটে আর কিছু নেই। মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে। চোখ বন্ধ করে 'ওয়াক' 'ওয়াক' শব্দ করছেন। আর মুখ দিয়ে গেঁজলা উঠছে। তাঁর অবস্থা দেখে আমরা আতঙ্কিত হ'য়ে পড়লাম। বাস থামাবার উপায় নেই। একমুখী সরু রাস্তা, লাইন বন্দী গাড়ি উঠে চলেছে চড়াইয়ে।

"দাদা আমার মাথা ঘুরছে ও গা পাক দিচ্ছে ভয়ানক!" কোন রকমে কথা শেষ ক'রে স্বপ্না সামনে ঝুঁকে পড়ল।

ওকে সাহস দিয়ে বললাম, "ও কিছু নয়, মনের ভুল। তুমি জানালার ধার ছেড়ে এ পাশে এসে বস।" আমি উঠে ওকে ভিতর দিকে সরিয়ে দিলাম।

তারপর দুটো লেবু-লজেন্স ওর মুখের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বললাম,

"শক্ত ক'রে দাঁতে চেপে ধর।" রূপেনকে একমুঠো লজেন্স দিয়ে আমিও দুটো মুখে পুরলাম। নিজে মনে মনে দুর্গানাম স্মরণ করলেও মুখে স্বপ্নাকে সাহস দিচ্ছি।

প্রায় হাজার ফুট নীচে পাশের খাদে একটি চূর্ণবিচূর্ণ বাস দেখতে পাওয়া গেল। বাসচালক যে যাত্রীসহ একই পথে যাত্রা করেছেন সেটা বুঝতে একটুও দেরী হ'ল না।

উৎরাইয়ের মুখে মোড় ঘুরবার সময় আমাদের বাস একটা ঠোক্কর খেল। ভগবানের দয়ার এবং বাসচালকের তৎপরতায় আমরা রক্ষা পেলাম।

বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। অল্পবিস্তর ঝাঁকুনি খেল সবাই। স্বপ্না মাথা নীচু ক'রে থাকায় জন্য বিশেষ বুঝতে পারল না। চালক পাঞ্জাবী, এদের সাহসের অন্ত নেই। অন্য কারুর পক্ষে এ রাস্তায় ষ্টিয়ারিং ধরা সম্ভব নয়।

বাস আবার চড়াইয়ে উঠছে। রাস্তার ধারে গভীর খাদ। অজস্র ঝরনার জল চারদিক থেকে এসে নদীর সৃষ্টি ক'রেছে। নীল জলরাশি গম্ভীর গর্জনে বিদ্যুৎগতিতে বয়ে চলেছে।

নদীর অপর পারে সুউচ্চ পর্বত। গভীর বনানী। সবুজের ফাঁকে ফাঁকে সুনীল আকাশে সাদা মেঘের টুকরোগুলি ভেলা ভাসিয়ে চলেছে।

পাহাড়ের গুহার মধ্যে বন্যজন্তুর আবাস। সরু রাস্তার বাঁকে মোড় ঘুরবার সময় বাসচালক মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করে চলেছে। এরই মধ্যে উপত্যকায় বেদানা, ডালিম, আখ্‌রোটের বাগান। অসংখ্য ফলে গাছগুলি ভর্তি। বাস থেকে ডালিমগুলি পাড়া যায়। কিন্তু আমরা সকলে লালসাহীন হ'য়ে পড়েছি। ভয় ব্যতীত আমরা অন্য সব রিপুকে জয় করে নিয়েছি।

ভগবান এবার আমাদের প্রতি প্রসন্ন হলেন। উৎরাইয়ের পথ

শেষ হ'য়ে সমতল ভূমিতে পড়লাম। সকলেরই অবস্থা স্বাভাবিক হ'য়ে এল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "স্বপ্না, এখন কেমন বোধ করছ?"

মাথা তুলে স্বপ্না বলল, "ভালই, দাদা আর দুটো লজেন্স দিন।"

আমি কয়েকটা লজেন্স রূপেনকে দিয়ে ঠোঙ্গাটা স্বপ্নার হাতে দিলাম। সে হাসিমুখে পিছন ফিরে ঠোঙ্গাটা রূপেনকে দেখাল।

একটা ঝুলান সেতুর উপর দিয়ে বাসটি ধীরে ধীরে পার হয়ে এল।

স্বপ্না উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এবার কোথায় এলাম জ্যেঠা মশায়? নদীটির নাম কি? চারিদিকে তো সৈনিকদের তাঁবু দেখছি।"

"আমরা রামবানে এসে গেলাম মা লক্ষ্মী। চন্দ্রভাগা নদীর নাম শুনেছ তো? ইংরাজিতে যাকে 'চেনব' বলে। নদীটির উপরে এই একমাত্র সেতুই ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রেখেছে।"

রূপেন বলল, "সেইজন্য লেখা আছে, ব্রীজের ফোটো তোলা ও ওখানে ধূমপান নিষেধ।"

স্বপ্না তির্যক চাহনিতে বলল, "ও তাই বুঝি পুলের দু'প্রান্তে রাইফেলধারী সৈনিক পাহারা দিচ্ছে?"

মৃত্যুর পদধ্বনি অস্পষ্ট হয়ে এখন দুর্গম পথের অবসান হ'ল। সামনের দিক থেকে গুঞ্জন উঠল, "বানিহাল দেখা দিয়েছে, আর ভয় নেই।"

স্বপ্না বৃদ্ধকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, "বানিহাল কি জ্যেঠামশায়?

বৃদ্ধ বললেন, "বানিহাল একটি ছোট শহর মা লক্ষ্মী। এখানেও পর্যটকদের জন্য রাত্রিবাসের ব্যবস্থা আছে। তবে 'কুদের' মত

বড় ডাকবাংলো নয়। এবার আমাদের একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।”

রূপেন জিজ্ঞাসা করল, “দাদা এটাকেই তো ‘জহরটানেল’ বলে ?”

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, “হ্যাঁ বাবা, এইটাই ‘জহরটানেল’। এটা না হওয়া পর্যন্ত আঠার মাইল ঘুর পথে দশ হাজার ফুট উপর দিয়ে রাস্তা ছিল। এ সুড়ঙ্গের জন্য প্রায় ষোল মাইল দূরত্ব কমে গেছে।”

স্বপ্না বলল, “এবার মনে পড়েছে জ্যেঠামশায়। পণ্ডিতজী তো বানিহাল সুড়ঙ্গের দ্বার উদ্বোধন করেছিলেন। এইটাই তো বর্তমানে ভারতের দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ পথ।”

“হ্যাঁ মা প্রায় দু’মাইল লম্বা। বহু ব্যয়ে ভারত সরকার এটি নির্মাণ করে কাশ্মীরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা পাকা করেছেন।”

আমাদের বাস ধীরে সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করল। বাস যাতায়াতের জন্যে দুইটি পৃথক সুড়ঙ্গ পাশাপাশিভাবে অবস্থিত। তার মধ্য দিয়ে লোকজনও যাতায়াত করে। সুড়ঙ্গের মধ্যে বিজলি বাতি আছে। বাস সুড়ঙ্গ পার হ’য়ে এপারে এল। স্বপ্না হাতঘড়ি দেখে বলল, “পাঁচ মিনিট সময় লাগল।”

রূপেন তার হাতঘড়ি দেখে বলল, “ঠিক সাড়ে চার মিনিট নিয়েছে।”

স্বপ্না বলল, “ঐ হ’ল, যার নাম চাল ভাজা তারই নাম মুড়ি। দু’ মাইল রাস্তা পার হ’তে আড়াই মিনিট ক’রে ভাগে পড়ল। কি বলেন দাদা ?” আমি ওদের দিকে ফিরে হাসলাম।

স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা এক মায়ার রাজ্যে আমরা প্রবেশ করলাম, সকলের সঙ্গেই শুভদৃষ্টি হ’ল ভূস্বর্গ কাশ্মীরের।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : ভেরীনাগ

আরও মিনিট কুড়ি চলার পর বাসগুলি নীচুমণ্ডায় এসে পৌঁছাল। তারপর অন্য পথ ধরে মন্থর গতিতে ভেরীনাগের দিকে এগিয়ে চলল।

পাহাড়ের গায় স্তরে স্তরে ধানক্ষেতগুলি ক্রমশঃ নীচে নেমে সুদূর সমতলভূমির সাথে এক হ'য়ে মিশে গেছে। আমাদের দৃষ্টিপথে ভেরীনাগ দেখা দিল।

বাস থেকে স্বপ্না প্রশ্ন করল, "ভেরীনাগ কি জ্যেঠামশায় ?"

"বিতস্তা নদীর উৎপত্তি স্থলকে ভেরীনাগ বলে। শুধু তাই নয় মা লক্ষ্মী, কাশ্মীরীদের নিকট ভেরীনাগ এক মহান পবিত্র তীর্থস্থান।"

বৃদ্ধের কথা শুনতে শুনতে আমরা কয়েক পা এগিয়ে কুণ্ডের ধারে এলাম। ভদ্রলোক সামনে পাহাড়ের গায় নদীর উৎপত্তিস্থল কুণ্ডটি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "১৬১২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর এই কুণ্ডের চারপাশ বাঁধিয়ে দেন। এর গভীরতা ৫৪ ফুট, ১৩৫ ঘনফুট জল প্রতি সেকেণ্ডে বিদ্যুৎগতিতে কুণ্ড থেকে প্রবাহিত হচ্ছে।"

স্বপ্না একটু সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, "জ্যেঠামশায় তবে এঁরা সকলে এটাকে ঝিলাম নদী বলছেন যে ?"

বৃদ্ধ এবার এক অপূর্ব ভঙ্গিমায় হাসলেন, তারপর স্বপ্নাকে লক্ষ্য করে বললেন, "মা লক্ষ্মী মুসলিম রাজত্বে বিতস্তাই ঝিলাম আখ্যায় ভূষিত হয়েছে।"

"ও মা তাই নাকি? বিতস্তার নাম তো আমরা ভূগোলে পড়েছি।"

"হ্যাঁ মা পড়েছ বই কি। পঞ্চনদীর দেশ পাঞ্জাব। এই ভেরী-নাগ থেকেই বিতস্তার উৎপত্তি। যেমন 'গঙ্গোত্রী' থেকে গঙ্গা, 'যমুনোত্রী' থেকে যমুনা। এখানে উৎপত্তি লাভ করে সর্পিল গতিতে শ্রীনগরের মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাঞ্জাবে প্রবেশ করেছে।"

ভদ্রলোক আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনারা এ জল খেয়ে দেখুন, এমন জল আর কোথাও পাবেন না।"

রূপেন বলল, "জ্যেঠামশাই আপনি আমাদের তুমি বলে ডাকলেই আমরা খুশী হব। আপনি সর্বতোভাবে আমাদের বড়। আপনি বললে আমরা কুণ্ঠা বোধ করি।"

"বেশ বেশ, শুনে সুখী হ'লাম। তোমরা ইয়ংবেঙ্গল, 'আপনি', 'আজ্ঞা', না বললে মনে ভাববে জ্যেঠামশায় সেকেলে লোক—কোন ভদ্রতাবোধ নেই।"

আমরা তাঁর কথা শুনে সকলেই হাসলাম। অন্য সকলের সঙ্গে স্বপ্না আঁজলা ভরে জল খেল অনেকখানি। রূপেন জামার আস্তিন্ গুটিয়ে জল খেতে সুরু করল।

স্বপ্না আমাকে বলল, "ওমা দাঁড়িয়ে দেখছেন কি? জল খান আগে, মাছের খেলা পরে দেখবেন।" রূপেন যোগ করল, "সত্যি দাদা এমন সুপেয় জল জীবনে কোন দিন খাই নি।"

বৃদ্ধ হেসে বললেন, "এমন জল কলকাতায় পাবে কোথায়? চোরপরেশনের জলের পাইপ দিয়ে তো নিত্যই সাপ বেরিয়ে আসে। এ বার কোন্ দিন খবরের কাগজে দেখব 'কুমীর' বার

হচ্ছে। আর বাংলার নদীগুলি তো কলকারখানার কৃপায় নর্দমায় রূপান্তরিত হ'য়েছে।"

ভদ্রলোকের কথা সকলেই একবাক্যে সমর্থন করলেন। বহু লোকের সঙ্গে আমিও আঁজলা ভর্তি জল খেলাম। পরিতৃপ্তিতে প্রাণ ভরে গেল। মনে হল পথের ক্লান্তি সব দূর হয়ে গেল।

বৃদ্ধের দিকে চেয়ে স্বপ্না বলল, "জ্যেঠামশায় কি সুন্দর উদ্যান দেখুন ও পাশে? মনে হচ্ছে এখনই যেন কোন শিল্পী নিপুণ হাতে সাজিয়ে দিয়ে গেল।"

প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে বৃদ্ধ বললেন, "এরই নাম মোগল উদ্যান মা, এর অপেক্ষা আরও সুন্দর মোগল উদ্যান তোমরা শ্রীনগরে গেলে দেখতে পাবে।"

স্বপ্না খুশী হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "জ্যেঠামশায় বোধ হয় কাশ্মীরে বহুবার এসেছেন?" বৃদ্ধ ম্লান হেসে বললেন, "হ্যাঁ মা প্রতি বছরই পূজার সময় আমাকে বাধ্য হয়ে এখানে আসতে হয় কোন আকর্ষণে।" স্বপ্না বৃদ্ধের স্বরের হঠাৎ পরিবর্তন দেখে ঔৎসুক্য প্রকাশ করল। বৃদ্ধ গম্ভীর হয়ে বললেন, "অন্য একদিন বলবো মা, এখন চল উদ্যানে এখানকার গাছের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই।"

একজন কাশ্মীরী এসে বৃদ্ধকে নমস্কার করে দাঁড়ালেন। ব্যাগ থেকে একটি টাকা বার ক'রে বৃদ্ধ তাঁর হাতে দিলেন। টাকা নিয়ে ভদ্রলোক আবার নমস্কার করে চলে গেলেন।

বৃদ্ধা বললেন, "ওরা কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও ধার্মিক লোক। এখন পর্যন্ত এঁরা যাগযজ্ঞ-পূজা-অর্চনা নিয়েই আছেন। বড় দুঃস্থ, তাই বিদেশী পর্যটক দেখলে সাহায্য প্রার্থী হয়।"

কিছুদূর এসে উদ্যানের মধ্যে একটি বিশাল বৃক্ষ দেখিয়ে বৃদ্ধ সকলকে বললেন, "এরই নাম 'চিনার গাছ'। আর ঐ সারিবন্দী

লম্বা গাছগুলি হ'ল 'পপলার'। এ গাছ মোগল রাজত্বের সময় পারশ্য থেকে এখানে এনে বসান হয়। এখন অবশ্য এগুলি কাশ্মীরের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে গেছে।"

স্বপ্না হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল, "আর জ্যেঠামশায় আপেল গাছ, যার জন্য এ সময় কাশ্মীর আসা ?"

বৃদ্ধ মৃদু হাসির সাথে বললেন, "তুমি তো মা আপেল গাছের নীচেই দাঁড়িয়ে আছ।"

আমরা সকলে কৌতূহলী হয়ে বৃদ্ধের দৃষ্টি অনুসরণ করলাম। স্বপ্না হাসিতে উপ্‌ছে পিছন ফিরে গাছটির দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে বলল, "ওমা তাই বুঝি ? কিন্তু জ্যেঠামশায় গাছে আপেল কই ?"

আর দিন পনের আগে এলে গাছ ভিত আপেল দেখতে পেতে মা। ভাদ্র মাসেই আপেলের পুরো মরসুম। ব্যবসায়ীরা এখন বাক্স ভর্তি করে লরীতে করে আপেলগুলো বাইরে চালান দিচ্ছে।"

রূপেন জিজ্ঞাসা করল, "আমরা তাহলে আর গাছে আপেল দেখতে পাব না ?"

স্বপ্না যোগ করল, "এ মা সেকি ? কাশ্মীরে আসাই তাহলে আমাদের বৃথা হয়ে যাবে।"

বৃদ্ধ বললেন, "একেবারে বৃথা যাবে না মা। পল্লী অঞ্চলে বেড়াতে গেলে এখনও সখের বাগানে আপেল দেখতে পাবে। তবে ওগুলি বিক্রীর জন্যে নয়, নিজেদের খাবার জন্যে রাখা।"

স্বপ্না বলল, "জ্যেঠামশায় গাছে আমরা আপেল দেখতে পেলেই খুশী হব। খাবার জন্যে তো বাজার আছে।"

"তা মাইল দশেক গেলেই দেখতে পাবে।"

বাসের হর্ন ঘন ঘন বাজতে শুরু করল। বৃদ্ধ বললেন, "আর

দেরী নয় চল। সকলেই চলে গেছেন, আমরা গেলে বাস ছেড়ে দেবে।"

আমরা তাড়াহুড়ো করে বাসে এসে উঠলাম, বাস ছেড়ে দিল।

ভেরীনাগ থেকে কিছুদূরে এসে বাস আবার বড় রাস্তায় উঠল। বৃদ্ধ আবার বলতে সুরু করলেন, "দেখেছ স্বপ্না? এই উঁচুতে কি সুন্দর সমতল ভূমি? কাশ্মীরের এইটাই এক বিশেষত্ব। পীর পাঞ্জাল পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা কাশ্মীর উপত্যকা কিন্তু বাংলার মতই 'সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং।"

স্বপ্না বলল, "তাই বুঝি বাংলার মত বহু জায়গায় ধান চাষ দেখলাম?"

"হ্যাঁ মা ভাতই কাশ্মীরীদের যে প্রধান খাদ্য। আর আলু, উচ্ছে, ঝিঙে, পটল, কুমড়ো, লাউ প্রভৃতি এদেশে প্রচুর জন্মায়। এ সবই এদের খাদ্য, ওরা আমাদের মতই ভেতো"—কথাটি বলেই হাসলেন।

"তাহলে বুঝুন জ্যেঠামশায় বাঙ্গালী খাদ্য খেয়েই কাশ্মীরী বোনেরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের অধিকারী হ'য়েছে। ভূস্বর্গ কাশ্মীরীবালাদের সঙ্গে বঙ্গললনারা এখন ব্রাকেটে ফার্ষ্ট।"

বৃদ্ধ হো হো ক'রে হেসে বললেন, "এবার স্বপ্না মায়ের কথায় যেন বিজ্ঞানের গন্ধ পাচ্ছি।"

রূপেন বলল, "জ্যেঠামশায় উনি কলেজে বিজ্ঞানেরই ছাত্রী ছিলেন।"

স্বপ্না পিছন ফিরে চাপা সুরে বলল, "তবুও ভালো। মর্তের কথা মনে পড়ছে এতক্ষণে। যে রকম জোর কলম চলছিল, তাতে মনে হচ্ছিল সৌন্দর্যের বর্ণনা লিখতে গিয়ে হয়তো সুন্দরীর মনে এবার বাসা বাঁধল।"

রূপেন মিষ্টি এক টুকরো হেসে বল, "কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বল নি।"

আমি ওদের কথায় মুখ টিপে হাসলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর বৃদ্ধ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন,

"স্বপ্না, এ জায়গার নাম 'খানাবল'। এবার আমরা সোজা শ্রীনগরের পথে চলেছি।"

স্বপ্না প্রশ্ন করল, "আর ঐ যে আর একটী রাস্তা ডান দিকে ছেড়ে এলাম?"

"ওটা মা 'অনন্তনাগ', পার হ'য়ে কাশ্মীরের দ্বিতীয় সৌন্দর্যময়ী নগরী পাহলগাঁও চলে গেছে।"

"হ্যাঁ জ্যেঠামশায়, আমরা বইয়ে পড়েছি তীর্থযাত্রীরা সেখান থেকে 'অমরনাথ' দর্শনে যান।"

"হ্যাঁ মা, পাহলগাঁও থেকে 'চন্দনবাড়ি' হ'য়ে তবে অমরনাথ যেতে হয়।"

সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। বাস সমতল রাস্তায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। কিছুক্ষণ পর বাস এসে তার গন্তব্য স্থানে থেমে গেল।

বৃদ্ধ স্বপ্নাকে বললেন, "আমরা শ্রীনগরে পৌঁছে গেছি, আজ আসি মা, পরে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।"

স্বপ্না তাড়াতাড়ি উঠে বৃদ্ধকে প্রণাম করতেই তিনি নেমে চলে গেলেন।

আমরা আর তাঁর সঙ্গে কোন কথা বলবার সময় পেলাম না। সামনেই লেখা আছে "টুরিষ্ট-অফিস, রেসিডেন্সী রোড, শ্রীনগর"।

যাত্রীরা সকলে একে একে নেমে মালপত্র নিয়ে নিজেদের গন্তব্যস্থানে যাত্রা করল। রূপেন একটি টাঙ্গার উপর মালপত্র চাপিয়ে সামনে উঠে বসল। তারপর আমাকে বলল, "দাদা আপনি ও স্বপ্না পিছনে বসুন।"

আমরা টাঙ্গায় উঠতেই টাঙ্গা ছেড়ে দিল। আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা বুলভার রোড ধরে ডাল লেকের ধার দিয়ে পার্ক হোটেলে পৌঁছে গেলাম। রাত প্রায় আটটা।

স্বপ্না হোটেলে নেমে এটা কি, ওটা কি, নানান প্রশ্ন করে আমাকে আটকে রাখল। রূপেন ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করে আমাকে ওদের আত্মীয় বলে একই সঙ্গে থাকবার ব্যবস্থা করে ফিরল।

ওরা একটি ডবল সীটের ঘর নিল। তারই সঙ্গে পেল লাগোয়া স্নান ঘর ও স্বতন্ত্র একটি প্রসাধন ঘর। প্রসাধন ঘর দিয়েই যাতায়াতের পথ। স্বপ্না হোটেলের ভৃত্য দিয়ে একটি খাট আনিয়ে প্রসাধন ঘরে পাতিয়ে, প্রথমেই আমার বিছানা করে দিল। তার-পর পাশের ঘরে খাটে নিজেদের বিছানা করে নিল। গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে সোফায় বসতেই বেয়ারা 'টী' পটে চা ও বিস্কুট দিয়ে গেল। চা খাবার আধঘণ্টা পরেই আমরা রাতের খাবার খেয়ে এলাম। তারপর ক্লান্ত দেহ নিয়ে বিছানা নিলাম ও অচিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : শ্রীনগর

স্বপ্নার ডাকে ঘুম ভাঙ্গল। চোখ চাইতেই বলল, "দাদা চা তৈরী, আপনি বাথরুম থেকে আসুন। চা খেয়ে আমরা সবাই বেরুব।"

আলস্য ভেঙ্গে বললাম, "এত ভোরে ?" "ওমা ভোর আবার কোথায় ? সকাল হ'য়ে গেছে যে।" স্বপ্না জানালার পর্দা সরিয়ে কাচের সার্শি খুলে দিল। মুঠো মুঠো শরতের সেনালি রোদ আমার বিছানার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল।

উঠে বসতেই স্বপ্না বাইরে হাত বাড়িয়ে বলল, "দাদা দেখুন কি অপূর্ব সুন্দর ?"

আমি তার পাশে এসে দেখি শঙ্করাচারিয়া পাহাড়টি অর্ধ বৃত্তাকারে আমাদের হোটেলের পিছন দিকে ঘিরে আছে। শিশির ভেজা রকমারি গোলাপগুলির উপর রোদ পড়ে অপরূপ সৌন্দর্যময় হ'য়ে উঠেছে। পাহাড়ের উপর থেকে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি ভেসে এসে মন উদাসী ক'রে দিচ্চে।

চা খেয়ে মখ্‌মলের মত নরম সবুজ মাঠে সিঁথির মত সুরকির রাস্তা দিয়ে চলে এলাম। সামনে করণ সিং বুলভার রোড। তার পাশেই কাশ্মীরের অপরূপ 'ডাল লেক্'। লেকে বহু হাউসবোট ও শিকারার সমারোহ। ওপারে হরিপর্বত। পর্বতের শৃঙ্গগুলি সোজা উপরে উঠে সুনীল আকাশের গায় মিশে গেছে।

স্বপ্না মুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। রূপেনও তদ্রূপ। ওদের জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হ'ল তোমাদের ?"

আবেশ মাখানো চোখ চেয়ে স্বপ্না বলল, "দাদা কাশ্মীরের এ দৃশ্য অপূর্ব।" রূপেন তার সঙ্গে যোগ করল, "এ দৃশ্য কোন দিন ভোলবার নয়।" আমি বললাম, "সত্যই মনোরম, আজকের সকাল আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হ'য়ে রইল।"

আমরা গেটের বাইরে বুলভার রোডে এলাম। চারদিক থেকে টাঙ্গা, শিকারা ও শালওয়ালারা এসে আমাদের চারপাশে ব্যূহ রচনা ক'রে দাঁড়াল।

স্বপ্না উত্তেজিত হ'য়ে বলল, "ও মা একি ফ্যাসাদ?"

রূপেন সায় দিয়ে বলল, "ফ্যাসাদ বলে ফ্যাসাদ?"

আমিও বিরক্ত হ'য়ে সকলকে বললাম, "আমরা কোথাও যাব না। প্রয়োজন হ'লে আমাদের জানা কাশ্মিরী হাউস আছে, সেইখানেই যাব।"

আমার কথা শেষ হ'তেই দলের মধ্য থেকে এক কাশ্মীরী যুবক কাশ্মীরী হাউসের পরিচয় পত্র বার ক'রে তাঁর সঙ্গে যাবার অনুরোধ জানালেন। শেষ পর্যন্ত আমাদের রাজী হ'তে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গেই ভিড়ও কমে গেল। ভদ্রলোক রাস্তা থেকে দু'খানা টাঙ্গা ভাড়া ক'রে আনলেন।

প্রথম টাঙ্গায় সামনে রূপেন ও পিছনে স্বপ্না উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্নার পাশে এক মহিলা আর রূপেনের পাশে এক তরুণ উঠে বসলেন। দ্বিতীয় খানাতে সামনে এক ভদ্রলোক উঠার সঙ্গেই পিছনে আর এক মহিলা ও আর এক তরুণ উঠে বসলেন। আমি দাঁড়িয়ে ভাবছি কি করি এমন সময় সামনের ভদ্রলোক তাঁর পাশে বসতে অনুরোধ করলেন। আমি টাঙ্গায় উঠলে টাঙ্গা ছেড়ে দিল। কাশ্মীরী যুবক তাঁর সাইকেলে চেপে আমাদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে চললেন।

স্বপ্না প্রথমটা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। আমি ওদের টাঙ্গায়

চাপিনি বলে, এখন ঠিক ওর সামনাসামনি হ'য়ে বসায় সে ভাবটা কেটে গিয়ে মুখে হাসি ফুটলো।

বুলভার রোড ধরে কিছুদূর এসে ডাল লক্ গেট দেখা গেল। সেটা পিছনে ফেলে টাঙ্গা ছুটল। পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ সুরু হ'ল। ভদ্রলোকের নাম শশীবাবু, তিনি জানালেন মেদিনীপুরে তাঁদের বাড়ী। বৌদি, স্ত্রী, ভাইপো, ভাইঝি ও ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। ভদ্রলোক কথা প্রসঙ্গে তাঁর দাদার নাম করলেন, আমি চিনতে পারলাম।

যদিও তাঁর দাদার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি, তবুও দীঘা বেড়াতে গিয়ে আমি তাঁর কাজের পরিচয় পেয়েছি। ভদ্রলোক কৃতিপুরুষ, স্থানীয় কংগ্রেসের কর্ণধার। গান্ধিজীর একজন প্রিয় শিষ্য বলে সুনাম আছে।

শ্রীনগরের রাস্তাগুলি সুন্দর। আমরা ঝিলামের ছু নাম্বার পুল পার হ'য়ে 'রেসিডেন্সি' রোড ধরে এগিয়ে চললাম। কিছুদূর যাওয়ার পর বড় রাস্তা ছেড়ে টাঙ্গা গলির মধ্যে ঢুকল। দুধারে ঘন বসতি। বাড়িগুলি বেশির ভাগ মাটির। ছাদগুলি কাঠের, কোনটা বা টিনের।

স্বপ্না বলল, "দেখছেন দাদা? এর মধ্যে ছোট ছোট দোকান—তেল, নুন, মশলা।"

আমি বললাম, "কোনটায় বা চাল ডাল।"

স্বপ্না যোগ করল, "তারই মধ্যে আবার সব্জী? কিন্তু কি বিশ্রী পরিবেশ? আরও লক্ষ্য ক'রে দেখুন সব গৃহস্থই কৌতূহলী হ'য়ে আমাদের দিকে চেয়ে দেখছে।"

আমি হেসে বললাম, "হ্যাঁ, বিশেষ করে পুরুষেরা তোমাদের দিকে চেয়ে আছে।"

"আহা, মোটেই না। বরং মেয়েরাই কৌতূহলী হ'য়ে ঠায় চেয়ে

দেখছে আপনাদের। কারুর সঙ্গে চোখাচোখি হ'লে মুখে হাসি উপছে পড়ছে ও আপন কাজে মন দিচ্ছে।"

আমি বললাম, "সেটা শুধু মেয়েরা নয়, পুরুষরাও।"

স্বপ্না বলল, "কিন্তু দাদা স্বাস্থ্য ও গায়ের রং অতুলনীয়, বিশেষ ক'রে মেয়েরা অপূর্ব সুন্দরী।"

আমি বললাম, "যে সব দু-চার জন পুরুষের গায়ের রঙ অল্প চাঁপা, তাঁরা ব্যবসায়ী। সারা বছর তাঁরা দেশে থাকেন না।"

স্বপ্না বলল, "কিন্তু সকলেরই নাক মুখ ও চোখের তুলনা হয় না।"

"হ্যাঁ শত ছিন্ন ময়লা পরিধেয় ভেদ ক'রে মেয়েদের অঙ্গ সৌষ্ঠব ফুটে বেরুচ্ছে।"

আমাদের কথোপকথন শুনে স্বপ্নার পাশে বসা মহিলাটি মুখ টিপে টিপে হাসছেন।

স্বপ্না হেসে বলল, "পথে আসুন দাদা। এবার বোঝা গেছে, কে কাকে দেখছে। কিন্তু আপনার আর্টিস্টের কি মনোভাব ?"

"সেটা তো তুমি ভাল বুঝবে। কারণ তুমি তো তার মনের দর্পণ।"

স্বপ্না মৃদু হাসল। তারপর বলল, "কিন্তু দাদা চোখে না দেখলে এমন দারিদ্র্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।"

"সত্যিই ভারি করুণ"—আমি স্বপ্নাকে সমর্থন করলাম।

কাশ্মীরী হাউসের সামনে এসে টাঙ্গা দাঁড়াল। শশীবাবু নীচে নেমে তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সদানন্দ লোক, ভাইঝি হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে হোটেলে শুয়ে আছেন সে কথা বলতেও বাদ দিলেন না। আমাদের পরস্পরের মধ্যে নমস্কার বিনিময়ের পালা সাঙ্গ হ'লে আমরা কাশ্মীরী যুবকের সঙ্গে বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম।

স্বপ্না আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, "দাদা কিছু ভয় টয় নেই তো ? কিছু হ'লে কাক পক্ষীও টের পাবে না।"

আমি হেসে তাকে অভয় দিলাম। স্বপ্না নাকে রুমাল চেপে ঠিক আমার আগে আগে চলল।

বাড়িটি বড় ও দোতলা। একতলা পর্যন্ত দেওয়াল ইঁটের, তারপর সবই কাঠের। নীচের তলা যেমন নোংরা তেমনি ভ্যাপ্‌সা একরকম দুর্গন্ধ! তারই মধ্যে শাল ও গালচের কারখানা। পাঁচ বছরের ছেলে থেকে আশী বছরের বুড়ো পর্যন্ত গায়ে ছেঁড়া মীরজাই এঁটে কাজ করছে। এদের নিপুণ হাত দিয়ে তাঁতে রঙিন নক্সার গালচে ও শাল বোনা হচ্ছে। অন্য ঘরে শিল্পীরা মাথায় টুপী ও পাগড়ী এঁটে শালের উপর ছুঁচ দিয়ে নক্সা তুলছে। সুদৃশ্য কলকা, ফুল, লতাপাতা—আরো কত কি!

কিছুক্ষণ আগে ভ্যাপ্‌সানি চাপা দুর্গন্ধে সকলেরই নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু কখন যে নাক থেকে রুমাল হাতের মুঠোর মধ্যে নিশ্চল হ'য়ে গেছে, সেদিকে কারুরই আর খেয়াল নেই। অপূর্ব এ দৃশ্য! অভিনব বলে মনে হচ্ছে সকলের কাছে।

রূপেন প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বলল, "দাদা পঙ্কজ পাঁকে জন্মায় প্রাকৃতিক নিয়মে, তাই বুঝি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্ভার এই পূতিগন্ধময় ধূলি ধূসরিত পরিবেশে সৃষ্টি হচ্ছে?"

আমি তার দিকে চেয়ে বললাম, "ঠিক তাই রূপেন।"

"কিন্তু দাদা এই সমস্ত শাল, স্কার্ফ, ক্লোক প্রভৃতি আভিজাত ঘরে রমনীদের অঙ্গে উঠে সৌন্দর্যের বন্যায় সকলকে ভাসিয়ে দেয়।"

স্বপ্না বলল, "সত্যি দাদা অদৃষ্টের এ কি নির্মম পরিহাস? এই অপরূপ শিল্প সৃজনীর অধিকারী হয়েও ওরা নিজেদের নগণ্য জীবন ধারণের ব্যয় বহনে অপারগ।"

আমি বললাম, "শুনেছি নোমাশ্বির 'সেণ্ট্রাল মার্কেটে' শিল্পীদের সরাসরি বিক্রীর ব্যবস্থাপনায় অবস্থার কিছুটা সুরাহা হ'য়েছে।"

কাশ্মীরী যুবকটি আমাদের সকলকে এবার উপরে যাবার অনুরোধ জানালেন।

স্বপ্না আমার পিছনে এসে বলল, "দাদা আপনি আগে চলুন, আমরা সকলে আপনার পিছনে আছি।" আমি হাসলাম।

শাল ফ্যাক্টরী দেখে আমরা উপরে এলাম।

কাশ্মীরী হাউসের স্বত্বাধিকারী গোলাম মুস্তাফা সাহেব দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের সকলকে অভ্যর্থনা করলেন।

শাল দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে আমরা কুশান ছেড়ে মুস্তাফা সাহেবের সঙ্গে ফরাসে বসলাম। শত সহস্র শাল, ক্লোক, স্কার্ফ প্রভৃতি দেখতে দেখতে হতবাক হ'য়ে পড়েছি। পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে ইসারায় বলছি, "এ যে সত্যই অপরূপ!" এরই মধ্যে ক্লান্ত চোখ কখন জানালা দিয়ে বাইরে চাইছে।

নীচে দেখা যাচ্ছে ঝিলাম নদী, তর তর শব্দে বয়ে চলেছে। নিস্তব্ধ ঘরে ঘড়ির টক্ টক্ শব্দে তার অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে সকলকে।

দু'ঘণ্টা সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল। সেদিকে কারুরই খেয়াল নেই। শাল দেখবার সময় কয়েকখানা বেছে রেখেছিলাম। একসঙ্গে সেগুলি নিয়ে দাম জিজ্ঞাসা করলাম।

স্বপ্না অবাক হ'য়ে বলল, "একদিনেই এতগুলি শাল কিনবেন দাদা? আরও কত ফ্যাক্টরী ও দোকান তো রয়েছে?"

"পছন্দ যখন হয়েছে নিয়ে নিই, আবার কবে সময় পাব কিনা জানি না।"

রূপেন বলল, "আমিও ঠিক আপনার সঙ্গে একমত, কিন্তু ওঁরা কিনুন আর নাই কিনুন নেড়ে চেড়ে ঘাঁটা ঘাঁটি করতে খুব ওস্তাদ, এ দোকান ও দোকান করে বললেন পছন্দ হ'ল না, আজ থাক।"

রূপেনের কথায় স্বপ্না হাসল।

সামান্য দরাদরির পর টাকা দিয়ে দিলাম। কথা প্রসঙ্গে মুস্তাফা সাহেব জানালেন, ওঁর বড় ছেলে বিলেতে ডাক্তারি পড়েন। আর আমাদের সঙ্গের যুবকটিকে দেখিয়ে বললেন, "এই আমার ছোট ছেলে, কারবার দেখাশুনা করার ভার ওর উপর।" মুস্তাফা সাহেব সিগারেটের প্যাকেট আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। আমরা ধূমপান করি না বলায় তিনি প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট ছেলেকে দিয়ে অপর একটি বার ক'রে নিজে ধরালেন।

দুপুরে মুস্তাফা সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে নীচে নেমেই শিকারায় উঠলাম। বৃদ্ধ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বার বার কুর্নিশ করলেন ও পুনরায় আসবার অনুরোধ জানালেন। মুস্তাফা সাহেবের ছোট ছেলে আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন।

শশীবাবু আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, "আপনার বোন ভারি সপ্রতিভ, যেমন মিশুক তেমনি আলাপী।" উত্তরে জানালাম, "ও ছেলেবেলা থেকেই খুব ডেয়ারিং।" স্নানাহার সেরে বিছানায় উঠলে ঘুমে চোখ বুজে এল। শুয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঝট্ পট্ শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দৌড়ে আসা স্লীপারের শব্দ আমার খাটের কাছে এসে থেমে গেল। স্বপ্নার কণ্ঠস্বর কানে এল,

> "ছুঁওনা ছুঁওনা বঁধু ওখানে থাক
> চেয়ার টানিয়া তুমি দূরেতে ব'স।
> (কিবা) মনের কথাটি মুখেতে ফুটেছে
> প্রিয়, রাগ রাগ আহা মরি ভাবটি।"

গান থামলে মুখ থেকে চাদর সরালাম। স্বপ্না আমার খাটে উঠে গম্ভীর হ'য়ে বসল। তার হাতে একখানা খাতা।

রূপেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ব্যাপার?" রূপেন জবাব দিল,

"দেখুন না স্বপ্নার ছেলেমানুষি ? "স্বপ্নার নয়—সেটা নিজের বল।" স্বপ্না কঠোর স্বরে জানিয়ে দিল।

"আমার ?" রূপেন গর্জে উঠলো।

"নিশ্চয়, তোমারই তো ?"

"যথা ?" রূপেন জানতে চাইল।

"দেখ আদর্শ মাতৃত্বের যুগ গত হ'য়েছে। সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে হ'লে পুরুষের এখন স্ত্রীর সাহচর্য অপরিহার্য।"

"বর্তমানে স্ত্রী তাহলে স্বামীর গার্জেন বল ?"

স্বপ্না সহাস্যে বলল, "হ্যাঁ, মরাল গার্জেন তো বটেই, ফিনান্সেও।"

"আর মা বাবা ও অন্য অভিভাবক ? সবাই বাণের জলে ভেসে গেলেন ?"

"তাঁরা ছেলের উচ্চ শিক্ষার খরচ জোগাবেন। আর ছেলের উপযুক্ত আর্থিক সঙ্গতি না হওয়া পর্যন্ত পকেট খরচা চালিয়ে যাবেন।"

"চমৎকার—। তাহলে বর্তমান যুগে মেয়ে হওয়াই তো সুবিধের।"

"বড় লেটে কথাটা বুঝেছ। যা হোক্ এখনও সময় আছে, সবে তো আঠাশ বছরে পড়েছ। বৈজ্ঞানিক যুগে সবই সম্ভব। বছর ছয়েক তো একটা স্বাদ ভোগ করলে,অন্যটাই বা বাকি থাকে কেন ?"

"কিন্তু তাহলে তোমার উপায় ?"

"হায় ভাগবান—। আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, আমার শ্বশুরমশায় যথেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন। বর্তমান যুগের অবস্থা চিন্তা করেই তিনি তাঁর বসত বাড়ির অর্দ্ধেক অংশ আমাকে দিয়ে গেছেন। আর আমার বাবাও একেবারে নিঃস্ব ছিলেন না। তাঁর বাড়ি তো ভাড়া চলছে। সেখানেও আমাদের তিন বোনের অংশ আছে।"

রূপেন নরম হ'য়ে আপোষের সুরে কথা বলল, "স্বপ্না তুমি একটা দিক চোখ মেলে চাইছ না। আমার না হয় বাবা মা নেই, কিন্তু তুমিও তো মা হয়েছ।"

স্বপ্না বলল, "বাবলুকে আমি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে ছেড়ে দেব, সেইটাই আমার স্বপ্ন ও সাধনা। তারপর সে যা করবে আমি মা হ'য়ে সেইটাই হাসিমুখে মেনে নেব। তাতেই আমার শান্তি। সে তো আমারই আত্মজ। বলেছি তো কাল প্রবাহকে কেউ রোধ করতে পারে না, আমার সে ইচ্ছা নয়।"

"উত্তম কথা, এখন কি করণীয়?" রূপেন জানতে চাইল, মুখে তার ব্যঙ্গের হাসি দেখা দিল।

স্বপ্না বলল, "ভাবীকালে স্ত্রীর অবাধ্য হ'লে আইনে শাস্তি পেতে হবে। যাতে তা না হয় তার জন্য এখন থেকে চেষ্টা কর, সাধনায় যাতে সব সিদ্ধি হও।"

রূপেন হেসে বলল, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন কিছুক্ষণ আগে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর সঙ্গে তোমার এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে।"

"আইনমন্ত্রী কি করবেন শুনি? তাঁরা তো জনসাধারণের হাতের পুতুল। আমাদের সংবিধান পড়ে দেখ নি? আর আইন দিয়ে কালের গতি রোধ করা যায় না এটা নিশ্চয় অস্বীকার ক'র না?"

"যেমন?" রূপেন প্রশ্ন করল।

"আদিম কালে গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব নারীর হাতে ছিল। মা গৃহকর্ত্রী হিসাবে সংসার বহুদিন চলেছে। তারপর সেটা পুরুষের অধীনে আসে। যুগ পরিবর্তনের সাথে কর্তৃত্বটা এখন স্ত্রীর হাতে এসে গেছে। একবার স্বচ্ছ চোখ চেয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের দিকে চেয়ে দেখ, স্বামীরা তো এখন স্ত্রীর হাতের সুইচ্। এটা বুঝতে পার নি?"

"বুঝতে আর পারি নি। হাড়ে হাড়ে 'মালুম' হচ্ছে। আমি তো তার জাজ্বল্যমান প্রতীক।" কথাটি শেষ ক'রে রূপেন হাসল।

ঠোঁটে বাঁকা হাসি চেপে স্বপ্না বলল, 'দেখ, লেখক সকলের জন্য লিখে থাকেন। কখনও সেটা ব্যক্তির, কখনও বা সমষ্টির। তোমার কালকের লেখাটা দাদাকে শোনাব বলে বার করেছিলাম, তুমি রাগ করছ—দরকার নেই।"

স্বপ্না তার হাতের খাতাটি রূপেনের দিকে ছুঁড়ে দিল। তারপর রূপেনের দিকে হাতের আড়াল ক'রে মুখটি ঢেকে আমার দিকে চেয়ে ঠোঁটে হাসির ঝিলিক তুলল।

রূপেন তাড়াতাড়ি খাতাটি উঠিয়ে স্বপ্নার পাশে রেখে চেয়ারে বসল। তারপর নম্রভাবে বলল, "দাদাকে শোনাবে বলে আমি রাগ করি নি। এই সামান্য লেখা শোনাবার কি আছে?"

আমি হেসে বললাম, "স্বপ্না তুমি পড়তে সুরু কর। রূপেনের কোন আপত্তি নেই।"

স্বপ্নার চোখ দিয়ে বিজয়িনীর হাসি খেলে গেল। স্বপ্না পড়তে সুরু করল,

"চির ঈপ্সিত রাজ্যে আমরা প্রবেশ করলাম। নীলিমা ভরা আকাশ পটে শুভ্র তুলো পেঁজা হালকা মেঘগুলি বলাকার মত ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলেছে দিকে দিকে।

"তার নীচে পীর পাঞ্জাল পর্বতমালায় ঘেরা সদ্য বন্যা স্নাত কাশ্মীরী উপত্যকা। শরতের অস্তগামী সূর্যের ঝলমল রশ্মি পড়ে যেন ধরিত্রী হাসছে। তার সবুজ তরঙ্গরাশি বাতাসে উদ্বেলিত হ'য়ে সৌন্দর্যের পশরা মেলে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানায় চারিদিকে।

"পথের দুপাশে গগনচুম্বী পপলার গাছগুলি সারি বেঁধে অপরূপ সুষমায় ভরিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যকে আরও রমণীয় ক'রে তুলেছে।"

"কাশ্মীরের মনোরম দৃশ্যে আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে অপলক নয়নে চেয়ে দেখে নির্বাক হয়ে যাই। নিজেকে হারিয়ে ফেলি প্রাকৃতিক পরিবেশে।

"মুহূর্তে ভুলে যাই পৃথিবীর সব দুঃখ শোক তাপ। মনে হয় এই তো স্বর্গ। আবেশে চোখ বুজে আসে অপার আনন্দে। অন্তঃস্থলে উপলব্ধি হয় হৃদয়ের আবেগ। সারা অঙ্গে বয়ে যায় চরম উত্তেজনা।

"শ্রীনগর কাশ্মীর ও জম্মুর প্রধান শহর ও রাজধানী, যাকে দেখবার জন্য আশৈশব ভারত সীমান্তে একদৃষ্টে চেয়ে থেকেছি। কতদিন কত সন্ধ্যা চলে গেছে মৌন চিন্তায়।

"খানাবল থেকে ঝিলাম বক্ষে নৌকাবিলাস দৃষ্টি পথে দেখা দিল। এখান থেকে পথের ধারে চিনার ও পপলার বৃক্ষশ্রেণী কাশ্মীরের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

"আমাদের চলার পথে, গোধূলি লগ্নে চিনার ও পপলার গাছের ফাঁক দিয়ে ঝিলামের সাথে শুভদৃষ্টি হ'তে থাকে নিয়ত।

"এই ভাবে এগিয়ে গেলে সন্ধ্যার অবগুণ্ঠন টেনে সামনে এসে ঝিলাম দাঁড়ায় চকিত কটাক্ষে।

"ঝিলামকে ছেড়ে আসার কিছুক্ষণ পরেই ডালের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় গাঢ় অন্ধকারে। কিন্তু সে যে এখন রূপের পশরা খুলে চলেছে অভিসারে।

"দৃষ্টি বিনিময়ের সাথে সলাজ হাসি মাখান মুখে বলে, 'বন্ধু সুস্বাগতম্ কাল দেখা হবে শুভ মুহূর্তে।

"শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে যায় তার দর্শনে। পুনরায় তার দিকে দৃষ্টি ফিরলে বলে 'লক্ষ্মীটি এখন ছাড়, 'আজ যে তোমরা বড় ক্লান্ত'। সুদূর দেড় হাজার মাইল পথ পার হ'য়ে এসেছে, এখন যে তোমাদের পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন।'

"আমি তো তোমার—।' তোমাদের আশাপথ চেয়ে কত যুগ গত হয়েছে গভীর নিরাশায়।'

"টাঙ্গা পার্ক হোটেলে প্রবেশ করার সাথে সাথেই দেখি ডাল অদৃশ্য হ'য়ে গেছে নিমেষে। তার অনুপম রূপ লাবণ্যের পরশে তনু হিল্লোলিত হ'য়ে দোলা দিতে থাকে আমার প্রতি অঙ্গে শিরা উপশিরায়।"

পড়া শেষ হয়ে গেল।—"সুন্দর, অতি সুন্দর" বলে আমি উঠে রূপেনের পিঠ চাপড়ে দিলাম।

রূপেনের মুখে ও চোখে খুশীর ভাব ফুটে উঠল। স্বপ্নার দৃষ্টি সেটা এড়াল না।

রূপেনের দিকে চেয়ে সে বলল, "দাদার আদরটি তো দিব্যি চুপ-চাপ হজম করলে, অথচ খাতাটি নেওয়ার জন্যে তখন তো বেশ চটিতং হয়েছিলে ?"

রূপেন হেসে বলল, "আমাকে আদর করা মানেই তোমাকে আদর করা।"

স্বপ্না রাগত হ'য়ে বলল, "আহা খুব হ'য়েছে, আর এত ভণিতায় কাজ নেই।"

আমি বললাম, "স্বপ্না রূপেনের কথাটি নেহাৎ মিথ্যে নয়, স্বামীর সুখ্যাতির স্ত্রী সত্যিই ভাগীদার।"

"সেটা সুখ্যাতির নয় দাদা, বরং অখ্যাতির তাই বলুন।"

"দেখ স্বামীর পদমর্যাদা বাড়ার সাথেই স্ত্রীর সম্মানও বেড়ে যায়। স্বামী স্যার হ'লে স্ত্রী লেডির পর্যায় প্রমোশন পায়।"

"আহা আমরা তো লেডি।"

"সেটা জেণ্টসের স্ত্রী বলে লেডি আর এটা হ'ল লর্ডের স্ত্রী ব'লে লেডি।"

স্বপ্না তীর্যক ভঙ্গিমায় চোখ দুটি উপর দিকে চেয়ে বলল, "কি রকম ?"

"ধর সাহিত্যিক বলে রূপেন ভারতরত্ন উপাধি পেয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তুমিও লেডিতে উন্নতা হ'লে।"

"ওরে বাবা? 'পদ্মশ্রী' বা পদ্মবিভূষণ' নয় একেবারে 'ভারত-রত্ন'? আমার মান তাহলে বেড়ে যাবে বলুন?"

"নিশ্চয়ই আমরাও তখন তোমাকে দস্তুর মত খাতির করে চলব।"

"আহা আমি বুঝি তাই বলেছি? দাদার সঙ্গে ছোটবোনের স্নেহের সম্পর্ক, স্নেহের সঙ্গে অপর কিছুর তুলনা চলে নাকি?"

"সে তখন দেখা যাবে।" আমি হাসলাম।

"দেখবেন ন' মণ তেলও পুড়বে না, আর রাধাও নাচবে না।" কথাটি শেষ ক'রে স্বপ্না উঠে দাঁড়াল। তারপর একটা হাই তুলে বলল, "আপনি এবার বিশ্রাম করুন, মিছেমিছি আপনার ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে দিলাম।"

"আর তোমরা?"

"আমরাও একটু গড়িয়ে নিই। তবে আজ আর কোথাও যাব না দাদা। ভাল জিনিস রয়ে বসে দেখতে ও খেতে আমি ভালবাসি।"

আমি হাসলাম। স্বপ্না ও রূপেন চলে গেল। আমি আবার শুয়ে পড়লাম।

নবম পরিচ্ছেদ

ঘুম আর এল না। উঠে পড়লাম। ঘড়িতে চারটা বাজল। স্বপ্না ও রূপেনকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লাম। গেটে মৃণাল-বাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। টাঙ্গায় আসছিলেন। সামনের দিকে তিনি, পিছনে আশুবাবু ও চণ্ডী।

টাঙ্গা থামিয়ে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে মৃণালবাবু বললেন, "দাদা বুঝি পার্ক হোটেলে উঠেছেন?"

"হ্যাঁ ভাই, আগে থেকেই ব্যবস্থা ছিল।"

"আজ সকাল থেকে কেবলই আপনাদের কথা মনে পড়ছিল।"

আমি মৃদু হেসে পিছন ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, "আশুবাবু কেমন আছেন?"

মৃণালবাবু বললেন, "দাদা আশুবাবুকে চেনেন দেখছি? কলকাতায় পাশাপাশি বাড়ি বুঝি।"

"না ভাই কাশ্মীর আসবার পথে আলাপ।" আশুবাবু কুণ্ঠিত হ'য়ে বললেন, "জানেন মিঃ চ্যাটার্জী, সেদিন এক মাড়োয়ারীর পাল্লায় পড়ে আপনাকে ছেড়ে আসতে বাধ্য হই, জানাবার আর ফুরসৎ পাই নি।"

"তাতে কি হ'য়েছে? খুব আলাপী লোকের সঙ্গে দেখা হ'লে ওরকমই হয়।"

মৃণালবাবু বললেন, "ঢেকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে কথাটি দেখছি মিথ্যে নয়।"

আশুবাবু বললেন, "কাকে আবার আপনি ধান ভানতে দেখলেন?"

"কেন, আপনাকে?"

"কি রকম?"

"বড়বাজার ছেড়ে এখানে এসেও মাড়োয়ারী জুটিয়েছেন।"

"আপনার মত তো বাপের হোটেল নেই মশায়, মাড়োয়ারী না জোটালে আমার হোটেল চালাবে কে?"

মৃণালবাবু হাসিমুখে বললেন, "আশুবাবু বাপ হ'য়েছেন আপনি, আর হোটেল চালাবে কি অপরে? এটা আশা করাই অন্যায়।"

আমি বললাম, "ছেড়ে দিন ও সব কথা, এখন সকলে চলেছেন কোথায় তাই বলুন?

মৃণালবাবু বললেল, "শাল প্রদর্শনী দেখতে যাচ্ছি। আপনাকে তাই তুলে নিতে নিলুম।"

আমি বললাম, "চলুন, বেড়ান হ'লেই আমি খুশী।" নোমাসির শিল্প প্রদর্শনীতে পৌঁছুতে পাঁচটা বাজল। আশুবাবু বললেন,"আপনারা প্রদর্শনী বলছিলেন, এদিকে নাম তো দেখছি সেন্ট্রাল মার্কেট।"

মৃণালবাবু বললেন, "প্রথম এখানে শাল-প্রদর্শনী সুরু হয়, তারপর কাশ্মীর সরকার পর্যটকদের সুবিধার জন্য এটাকে স্থায়ীভাবে রেখে 'সেন্ট্রাল মার্কেট' নাম দিয়েছেন।"

আশুবাবু বললেন, 'তাহ'লে এটা শালের বড় বাজার বলুন?"

"যে যা বোঝেন, তবে আশুবাবু এখানে দরাদরি নেই। আর দালালের খপ্পরে পড়ে অযথা হয়রানিও হ'তে হয় না।"

আশুবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, "আপনাদের যেমন কথা! বিজনেস্ লাইনের আপনারা কি বোঝেন মশায়? দালাল ছাড়া

ব্যবসা চলে নাকি? দুধে জল, দ্রব্যে ভেজাল, কারবারে দালাল, আর রাজত্বে ঘুষ না থাকলে পৃথিবী উল্টে যেত।"

আমি হেসে বললাম, "তা যা বলেছেন আশুবাবু, একেবারে খাঁটি কথা। এগুলি সব একই শ্রেণীভুক্ত। বিশেষ ক'রে এ যুগে।"

আশুবাবু উৎসাহিত হ'য়ে বললেন, "ঘুষের একটা কি সুবিধা জানেন? কিছু দক্ষিণা ছাড়লেই কার্য্য সিদ্ধি। সব বাধাবিঘ্ন কোথা দিয়ে কেটে যাবে।"

"দালালিও তাই। কিছু ট্যাঁক থেকে খসালে দেখবেন হাতের মুঠোর মধ্যে বাঞ্ছিত জিনিস এসে যাবে। পূজা-পার্বণ, শ্রাদ্ধ-শান্তি, এ সবই তো ঘুষ বা দালালির রকমফের। পথ হাঁটবার সহজ সরল পন্থা।"

কথাটি শেষ ক'রে ভদ্রলোক হো হো ক'রে হাসতে লাগলেন।

দুটো রাস্তার মোড়ের মাথার অনেকখানি জায়গা জুড়ে 'সেণ্ট্রাল মার্কেট'।

আমরা বাজারে ঢুকে পার্কের বেঞ্চিতে বসলাম। প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর রমণীয় একটি উদ্যান। চারদিকে মৌসুমী ফুলের মধ্যে কয়েকটি ফুটন্ত গোলাপও শোভা পাচ্ছে। তারই মধ্যে কয়েকটি চিনার গাছ ও কৃত্রিম উৎস।

উদ্যানের চারধারে অসংখ্য দোকান। দোকানের সামনে খোলা বারান্দা, প্রতি দোকান কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ শিল্প সম্ভারে পূর্ণ। পশম ও রেশম জাত দ্রব্য বস্ত্র ছাড়া কাগজমণ্ডের খেলনা, গৃহসজ্জা, কাঠের আসবাবপত্র, মৃগনাভি, জাফরান, পদ্মমধু প্রভৃতি কত কি?

সূর্য্যের লাল আলো আকাশে মিলিয়ে যাবার পূর্বে রঙিন বৈদ্যুতিক আলোগুলি কৃত্রিম প্রস্রবণ ও উদ্যানের চারদিকে ঝলমলিয়ে উঠল। রকমারি আলোতে উদ্যানটি এক অপরূপ সৌন্দর্যে ভ'রে গেল।

আশুবাবু বললেন, "চলুন এবার বাজারটি ঘুরে দেখি।"

মৃণালবাবু বললেন, "যথা আজ্ঞা মহারাজ।"

"উঠুন দাদা"—বলে মৃণালবাবু আমার দিকে চাইলেন।

আমরা দল বেঁধে দোকানের সামনের বারান্দা দিয়ে হেঁটে চলেছি। প্রতি দোকান থেকেই বিনীত আবেদন আসছে ইংরেজি, উর্দু ও বাংলায়, "মশায় দয়া করে এসে দেখে যান কাশ্মীরী খানদানি জিনিস সস্তায় কিনে নিয়ে যান।"

আমরা কোন কোন দোকানে ঢুকে খুশিমত শাল, স্কার্ফ মাফলার প্রভৃতি দেখছি। অপূর্ব এ দৃশ্য। পৃথিবীর অন্য কোথাও এ দৃশ্য আছে কি না সন্দেহ!

মৃণালবাবু বললেন, "দাদা মনে হচ্ছে অসংখ্য সুরভিত পুষ্প-মালিকা থরে থরে সাজান আছে।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, এঁরা জন্মশিল্পী, বিধাতার শ্রেষ্ঠ শিল্প সম্ভারের সৃজনী শক্তি ও প্রতিভা নিয়ে স্বর্গচ্যুত হয়েছেন।"

মৃণালবাবু বললেন, "সত্যই অপূর্ব ও অভিনব এঁদের দক্ষতা।"

দু ঘণ্টা ধরে বহু দোকান ঘুরে ক্লান্তিভরা চোখ নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

মৃণালবাবু বললেন, "চলুন দাদা এবার ফেরা যাক।"

আশেপাশে দৃষ্টি মেলে সঙ্গের অপর দুটি মানুষকে না দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, "আশুবাবু কোথায়?"

"বহুক্ষণ থেকেই পিতা বা পুত্রের কারো দর্শন নেই। হয়তো আবার কোন মাড়োয়াড়ীর সন্ধান পেয়েছেন।"

আমি বললাম "সত্য, টিপিক্যাল ব্যবসায়ী।" আমরা আরও কিছুক্ষণ আশুবাবুর জন্য অপেক্ষা করে গেট দিয়ে বার হয়ে রাস্তা চলতে সুরু করলাম।

ঘরে আলো জ্বলছিল। সাড়া না দিয়েই ভিতরে এলাম।

দেওয়াল ঘড়িতে দশটা বাজলো! স্বপ্না পা তুলে গালে হাত দিয়ে কুশানে বসে। দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরান। রূপেন অন্য চেয়ারে বসে একমনে ইলাস্ট্রেটেড সাপ্তাহিকের ছবি দেছে।

আমাকে দেখে রূপেন উঠে পড়ল। রূপেনকে উঠতে দেখে স্বপ্না ঘাড় ফেরাল ও আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল, কিন্তু কোন কথা বলল না। পা নামিয়ে ঘুরে বসল। রূপেনও কিছু জিজ্ঞাসা করল না।

ঘরের গুমোট হাওয়া কাটাবার জন্য স্বপ্নার পাশে বসে জবাব-দিহির সুরে বললাম, "নোমাসি শাল প্রদর্শনীতে গিয়ে এমনই মত্ত হয়ে দেখছি যে সময়ের খেয়াল নেই একেবারে। দোকান বন্ধ করছে দেখে হুঁশ হল। হাতঘড়িতে দেখি আটটা বাজে। লোক জন ফাঁকা হয়ে গেছে। পথে এসে দেখি রাস্তা জনশূন্য।"

স্বপ্না বড় বড় চোখে বলল, 'কি ভয়ানক?" এব দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

রূপেন চেয়ার টেনে আমাদের সামনে বসে বলল, "তারপর?"

"হাঁটছি তো হাঁটছি, শীত গিয়ে গরমে ঘাম ছুটতে লাগল, এই দেখ না।"

ভিতরে গেঞ্জিটা স্পর্শ করে স্বপ্না বলল, "ও মাগো এ যে ভিজে জব্‌জব্‌ করছে। শীগ্‌গীর ছাড়ুন বলছি। না, আপনি একটা কাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়বেন না।"

গেঞ্জি খুললাম। স্বপ্না একটা তোয়ালে দিয়ে বলল, "গাটা ভাল ক'রে মুছে এই গেঞ্জিটা পরুন।" গেঞ্জি গায়ে দিতেই স্বপ্না একটা আলোয়ান আমার গায়ে জড়িয়ে দিল।

স্বপ্নার ঘণ্টা বাজানোর শব্দে বেয়ারা এলে সে বলল, "এবার চা আনো। অর্দ্ধেক কোকো মিলিয়ে। অন্য কিছু চাই না, স্রেফ্‌ নোন্‌তা বিস্কুট।"

বেয়ারা চলে গেলে স্বপ্না বললে, "দাদা কলে এখনও গরম জল আছে, বেশ করে মুখ হাত ধুয়ে আসুন।"

আমি বিনা বাক্য ব্যয়ে বাথরুমে ঢুকলাম। স্নান ঘর থেকে ফিরে বিস্কুটে কামড় দিয়ে চায়ে চুমুক দিলাম। ওরাও চা খেতে সুরু করল।

স্বপ্নাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমরা এখন চা খাচ্ছ—খাবার খাওনি ?"

স্বপ্নার চোখে হাসি খেলে গেল। রূপেন বলল, "চা খাওয়াই হয় নি আবার খাবার ?"

"আশ্চর্য, তোমরা এত রাত পর্যন্ত খাওনি কেন ?"

"তাহলে আপনার বোন আমাকে আস্ত রাখতেন ?" কথাটা শেষ ক'রে রূপেন স্বপ্নার দিকে ফিরে হাসল।

হাসিমুখে স্বপ্না রূপেনকে বলল, "তুমি যে ভাবে দাদার সামনে আমার গুণগান করছো, তাতে উনি মনে করবেন সত্যই আমি তোমাকে খেতে দিইনি। অথচ বার বার আমি তোমাকে খাবার জন্য বলেছি।"

আমি বললাম, "স্বীকার করেছি রূপেন তোমার কথা শোনে নি, কিন্তু তুমি খাও নি কেন তার জবাব দেবে কে ?"

"সত্যি বলব ?"

"মিথ্যা বলবে এ আশা আমি করি না।"

"মন খারাপ হ'লে আমার গলা দিয়ে কিছু নামতে চায় না দাদা।"

"কিন্তু রূপেনের, ওর তো ক্ষিধেতে কষ্ট হচ্ছিল ?"

"উনি ফাঁক তালে বৌকে একটু সহানুভূতি দেখিয়ে নাম কিনলেন আপনার কাছে।"

স্বপ্নার কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম।

কাপগুলি আবার স্বপ্না ভ'রে দিল। রূপেন বলল, "এবার বলুন দাদা।"

স্বপ্না বলল, "হ্যাঁ, তবে গোড়া থেকে সুরু করুন।"

আমি বলতে সুরু করলাম, "তোমরা আমার ঘর থেকে চলে গেলে আমি শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আর এলো না। কিছুক্ষণ পর পোষাক পরে বার হলাম। গেটে আসতে মৃণালবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। টাঙ্গায় উঠিয়ে নিয়ে বললেন, চলুন দাদা নোমাসীর শাল প্রদর্শনী দেখে আসি।"

"তারপর?" স্বপ্নার ঔৎসুক্য দেখা দিল। বললাম, "উত্তম প্রস্তাব।" দেখি পিছনে আশুবাবু ও তাঁর ছেলে বসে আছেন।

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, "আশুবাবু কে দাদা?"

রূপেন বলল, "ঐ যে ব্যবসায়ী ভদ্রলোক যিনি পাঠানকোটে দাদাকে কিছু না বলে গা ঢাকা দেন।"

স্বপ্না বলল, "যত সব অযাত্রা। সেদিনকার জন্য কি কৈফিয়ৎ দিলেন ভদ্রলোক?"

বললেন, "এক পরিচিত মাড়োয়াড়ীর সঙ্গে দেখা হ'ল তার অনুরোধ আর এড়াতে পারেন নি।"

স্বপ্না বলল, "এঁরা স্বার্থপর। নিজের সুবিধা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু বোঝেন না।"

রূপেন বলল, "বাঙ্গালীদের ব্যবসা লাইনে যেতে তো স্যার পি, সি রায় অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন।"

"গুলি মারো ও রকম ব্যবসার, আচার্য রায়ের উপদেশ বোঝবার যোগ্যতা তোমাদের এখনও হয়নি।"

"বল কি? আমিও তো বাঙ্গালী। সম্ভব হলে ব্যবসা লাইনে যাবার চেষ্টা করব।"

স্বপ্না হেসে বলল, "তাহলেই হয়েছে।"

রূপেন বলল, "কি রকম বল না একটু শুনি।"

স্বপ্না বলল, "তিনি সমবায় প্রথায় দেশে শিল্প গড়ে তুলতে আর

তার সঙ্গে আমদানি ও রপ্তানি ক'রে দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন।"

"তার জন্যে চাই প্রচুর অর্থ সে কথা স্বীকার কর?"

"একেবারে অস্বীকার করি নে, তবে অর্থের সঙ্গে চাই বুদ্ধি, শ্রম ও সততা। এইগুলি হ'ল ব্যবসার সত্যিকারের মূলধন। স্রেফ্ চিটিং-বাজি বা ফোর টোয়েন্টির দ্বারা পেটের ভাত যদি বা রোজগার করা যায়—তাকে মূলধন ক'রে ব্যবসা করা চলে না।"

রূপেন বলল, "ছেড়ে দাও না ও সব কথা। তারপর দাদা, কি হ'ল বলুন।"

বললাম, "আশুবাবু ও তাঁর পুত্র আবার কখন যে কেটে পড়েছেন আমরা টের পাই নি। মৃণালবাবু ও আমি হাঁটতে স্বরু করলাম। তখন আটটা বেজে গেছে। রাস্তা প্রায় জনমানবশূন্য।"

রূপেন জিজ্ঞাসা করল, "রাস্তায় কোন টাঙ্গা পেলেন না?'

"পেয়েছিলাম, ইচ্ছে করেই নিই নি। হঠাৎ যদি গলির মধ্যে নিয়ে যায়। সকালে তো গলির অবস্থা দেখেছ?"

স্বপ্না বলল, "কি ভয়ানক, শুনেই আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।"

"কিন্তু স্থানীয় লোকেরা খুব ভদ্র ও বিশ্বাসী। যাকে জিজ্ঞাসা করেছি তিনিই পথ বলে দিয়েছেন।"

কেউ বললেন, "পার্ক হোটেল 'ডাল লেক'? সে তো বহুদূর।'

কেউ বললেন, "কম করে চার মাইল। টাঙ্গায় যান, নচেৎ পৌঁছুতে রাত দশটা বাজবে।"

রূপেন বলল, "তারপর?"

"আমরা একই প্রশ্ন বিভিন্ন লোককে বার বার জিজ্ঞাসা ক'রে পথ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছি।"

কিছুদূর চলার পর আমরা ঝিলামের উপর 'আমিরা কাদান' সেতুর উপর উঠলাম। মাঝখানটা ঝাপ্সা অন্ধকার। আমাদের ঠিক

পাশ দিয়ে দু'জন অল্পবয়স্কা মহিলা চলে গেলেন। সর্বাঙ্গ কালো বোরখা ঢাকা, মুখের অংশটুকু কিন্তু খোলা।"

মৃণালবাবু বললেন, "দাদা একবৃন্তে দুটি প্রস্ফুটিত গোলাপ যেন আন্দোলিত অবস্থায় চলে গেল।"

স্বপ্না বলল,' 'মৃণাল ঠাকুরপোর সঙ্গে এবার দেখা হলে হয়, বিয়ে করবার নাম নেই, কেবল রূপ দেখে কবিত্ব করা হচ্ছে।"

রূপেন জিজ্ঞাসা করল, "দাদা মনে হয় এখানে শতকরা নব্বুই-জনই মুসলমান?"

"প্রায় তাই, তবে জম্মুতে ঠিক এর বিপরীত।"

"কিন্তু সাধারণ মুসলমানরা তো পর্দানসীন, তাই নয়?"

"না, তবে সম্ভ্রান্ত ঘরে বোর্খার প্রচলন আছে।"

স্বপ্না বলল, "আর হিন্দুরা?"

"হিন্দুদের মধ্যে ঘোমটার প্রচলন আছে।"

রূপেন বলল, "তারপর?"

আরও কিছুদূর এসে মৃণালবাবু পথচারী দুই ভদ্রলোককে ডাল লেকের দূরত্ব জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা ইংরাজীতে জানিয়ে দিলেন পর্যটকদের জন্যে কাশ্মীরীদের জীবিকা নির্বাহ হয়।

স্বপ্না বলল, "ভারি সজ্জন লোক তো!"

"হ্যাঁ, তারপর আমি তাঁদের বললাম এ কথাটা যেন ভুলে যাবেন না।"

তাঁরা হেসে বললেন, "নিশ্চয় নয়? ভুলবো কেন মশায়?"

মৃণালবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে চালের দাম কত?"

একজন বললেন, "পাঁচ আনা সের।"

মৃণালবাবু বললেন, "আমাদের দেশে কিন্তু চৌদ্দ আনা। ফিরে গিয়ে হয়ত পুরো একটাকাই দেখতে পাব।"

তাঁরা বললেন, "আপনারাই তো আমাদের খাদ্য দেন। ভারত

সরকারের দয়ায় আমরা সস্তায় খেয়ে বেঁচে আছি।" গলার স্বরে তাঁদের কৃতজ্ঞতার সুর প্রকাশ পেল।

স্বপ্না বলল, "সত্যই ভারি ভদ্র।"

রূপেন বলল, "তারপর?"

মৃণালবাবু বললেন, "এ কথাটিও কিন্তু মনে রাখবার?"

এবার এক ভদ্রলোক বললেন, "আপনার এরূপ মন্তব্যের তাৎপর্য এবার আমরা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এখানকার অধিকাংশ লোক নিরক্ষর। কুসংস্কারে দেশ ভরে আছে। ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের যুক্ত হওয়ায় আমরা খুশী। নইলে আমাদের দুর্দশা চরমে উঠত। শিক্ষার দ্বারা অন্ধ গোঁড়ামি কেটে যায়। রুচির মর্মও উপলব্ধি হয়। তখন প্রকৃত বন্ধুকে চেনা যায়, কিন্তু যেটা আমাদের কাছে স্বচ্ছ, আমাদের বাপ মার কাছে সেটা এখনও পর্যন্ত অন্ধকারেই আছে। ধর্ম তাঁদের প্রাণ। তবে আবহাওয়ার পরিবর্তন সুরু হয়েছে।"

আমি এবার বললাম, "আপনাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে খুশী হলাম। আমরা বাঙ্গালী, কলকাতা থেকে এসেছি।"

তাঁরা হেসে বললেন, "আপনাদের পোষাক ও কথা শুনেই সেটা বুঝেছি।"

"বাঙ্গালীরাই তো কাশ্মীরে বেশী আসেন। বিশেষ করে এই সময়।"

অপর ভদ্রলোক বললেন, "শুধু এ সময় নয়, জুলাই-এর শেষে 'অমরনাথ' যাবার সময়ও বাঙ্গালীদের বেশ ভিড় হয়।"

মৃণালবাবু বললেন, "হ্যাঁ তখন তীর্থযাত্রীদের, আর এখন ভ্রমণ বিলাসীদের।"

"আপনারা তো ভ্রমণ বিলাসী?"

কথাটি বলেই তাঁরা হাসলেন। আমরাও তাতে যোগ দিলাম।

শুভরাত্রি বিনিময়ের পর তাঁরা পুনরায় বললেন, "আপনারা এই

রেসিডেন্সি রোড ধ'রে বরাবর সোজা চলে যান। তারপর ঝিলামের সেতু পার হ'য়ে বাঁ দিকে ডালের ধার দিয়ে গেলেই ডানদিকে পার্ক হোটেল পাবেন।"

আমরা তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে চলতে সুরু করলাম।

হোটেলের সামনে এসে মৃণালবাবু বললেন, "দাদা আজ এখান থেকেই শুভরাত্রি। কাল সকালে গিয়ে বৌদির সঙ্গে দেখা করব।"

আমি বললাম, "নিশ্চয় আসবেন, শুভরাত্রি।"

স্বপ্না বলল, "দাদা সকলেই সাধু নয়। যদি কেউ ভুল রাস্তা বলে দিত?"

"কথাটা তোমার যুক্তিসঙ্গত, তবে 'শঙ্করাচারিয়া' মহাদেবের দৃষ্টি অভ্যাগতদের জন্য সদা জাগ্রত। বহুদূর থেকে আমরা তাঁর মন্দিরের আলো দেখে নিঃশঙ্কচিত্তে পথ চলেছি। প্রথমে আমরা ভয় পেয়েছিলাম। সে ভুল ভাঙতে দেরী হয় নি। বিদেশী পর্যটকদের জন্য প্রাণ দেবে তবু তাদের অনিষ্ট হতে দেবে না।"

স্বপ্না দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে শঙ্করাচারিয়ার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, "দাদা আজ আমাকে একটা কথা দিতে হবে।"

"বল, নিশ্চয়ই দেব।"

স্বপ্নার মুখে পলকের জন্য রক্তের ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেল। বলল, "অন্ততঃ কাশ্মীরে যে ক'টা দিন আমরা আছি, যেখানেই যান, আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে।"

"তাই হবে স্বপ্না, আমি কথা দিলাম। চল এবার খেতে যাই।"

দশম পরিচ্ছেদ

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে সাতটা বাজল। ঘুম থেকে উঠে জানালার পর্দা সরালাম, কিন্তু একি? চারদিক অন্ধকার। ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। সাড়া পেয়ে স্বপ্না ও রূপেন এ ঘরে এল।

রূপেন বলল, "ভোর থেকেই দাদা বৃষ্টি নেমেছে।"

স্বপ্না বলল, "মোটেই নয়, রাত তিনটা থেকে বৃষ্টি নেমেছে। তখন মেঘের গর্জন তোমার নাসিকা গর্জনের কাছে চাপা পড়ে যাচ্ছিল।"

আমি রূপেনের দিকে চেয়ে হাসলাম।

রূপেন বলল, "দাদা এ নালিশ স্বপ্নার বহুদিনের, অথচ আজ পর্যন্ত হাতে নাতে স্বপ্না এর প্রমাণ দিতে পারে নি।"

"মশায়, নিজের নাক ডাকা কেউ কোনদিনই শুনতে পায় না। শোনবার মত অবস্থা হ'লে নাক ডাকা আপনিই বন্ধ হ'য়ে যায়।"

পরক্ষণই হেসে স্বপ্না বলল, "দাদাও কম যান না। জানালার পর্দাগুলি ভাল ক'রে এঁটে দিতে এসে দেখি দাদারও নাক ডাকছে। তবে ভদ্রভাবে।"

রূপেন বলল, "শুনুন কথা, নাক ডাকার আবার ভদ্র অভদ্র! আজ সকাল থেকেই সুরু হ'ল। যাকে বলে গায়ে পড়ে ঝগড়া করা।"

আমি হাসতে হাসতে স্নান ঘরে ঢুকলাম।

বাথরুম থেকে এসে আমরা তিনজনায় বারান্দায় একটা গোল টেবিলের সামনে বসলাম। বহুলোক এখানে চা খাচ্ছেন।

স্বপ্না বলল, "বৃষ্টির সাথে আবহাওয়ার কি পরিবর্তন, প্রকৃতি একেবারে রুদ্রমূর্তি ধরেছেন।"

রূপেন বলল, "পাহাড়ী দেশের মজাই এই। শিলং, দার্জিলিং, কাশ্মীর—যে যেখানেই যাও না কেন আকাশে মেঘ হ'লে আর রক্ষা নেই।"

আমি বললাম, "দেখ কাজল কালো মেঘগুলি দূর থেকে এসে পাহাড়ের গায় কেমন আটকা পড়েছে।"

স্বপ্না বলল, "আটকা পড়েই তো হুড় হুড় করে জল ঢালছে।"

রূপেন বলল, "আর তার সঙ্গে কন্ কনে বাতাস জামার মধ্যে দিয়ে ভিতরে ঢুকে হাড় কাঁপাচ্ছে।"

ভৃত্য চা ও প্রাতঃরাশ দিয়ে গেল। আমাদের পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে স্বপ্নার আলাপ জমে উঠেছে। লোহার ব্যবসায়ী মিঃ দাঁ, রিষড়ায় বাড়ী। সঙ্গে আছেন স্ত্রী ও তাঁর সহোদরা এবং বন্ধু মিঃ পাল। মিসেস দাঁ মিষ্টি হাসির টুকরো ছড়িয়ে বললেন, "বর্ষায় অতিষ্ঠ হ'য়ে দেশ ছেড়ে এখানে এলাম, কিন্তু মেঘও ঠিক সঙ্গ নিয়েছে। বিধাতা একেবারে বেরসিক।"

তাঁর দিদি জবাব দিলেন "বিধাতার দোষ কি? কপাল তো সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছ। সে কথা ভুলছ কেন?"

স্বপ্না হেসে বলল, "মনের কথা একেবারে টেনে বলেছেন দিদি।"

স্বপ্নার কথায় সকলেই হেসে উঠলেন। আমাদের এ পাশে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মিঃ দাস, মিসেস্ দাসও পুত্র কন্যার সঙ্গে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। ভদ্রমহিলা খুব আলাপী। আলিপুরের বাসিন্দা শুনে আমি মিঃ দাসকে বললাম, "আপনাদের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে ভালই

হ'ল। এবার অপিস ফেরতা মিসেস দাসের কাছে চা-টা খেয়ে বাড়ি ফেরা যাবে।"

মিঃ দাসও কমতি যান না। তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, আমরা চায়ের জল চাপিয়ে আপনার 'টা' এর জন্য অপেক্ষা করবো।"

আবার একটা হাসির ঢেউ উঠল চারদিকে।

চা বা কফি খাওয়ার সাথে টুকিটাকি খোস গল্প চালালেও মন কিন্তু সকলেরই বিষণ্ণ। সবাই ভাবছেন কাশ্মীরের মত জায়গায় এসে গুণ্তি দিনের একটি দিন মাঠে মারা গেল। দুর্যোগের আজই শেষ, না এই সবে সুরু।

সকলের আন্তরিক প্রার্থনায় প্রকৃতিদেবী সদয় হ'য়ে কয়েক ঘণ্টার পর তাঁর রুদ্রমূর্তি পরিবর্তন করলেন। বেলা দুটোর সময় সূর্যদেব হাসিমুখে দেখা দিয়ে সকলকে অভয় দিলেন।

বিছানায় বসে গতকালের কেনা শালগুলি সুটকেসে গুছিয়ে রাখছি। স্বপ্না ও রূপেন ও ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ দরজায় বার দুই টোকা পড়ল। তারপর এক মহিলা পর্দা সরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভিতরে আসতে পারি ?"

"নিশ্চয়ই, আসুন আসুন"—বলে আমি অভ্যর্থনা করলাম। এক যুবকের সঙ্গে মহিলা ভিতরে প্রবেশ করলেন।

আমি তাঁকে বসতে অনুরোধ করলে ভদ্রমহিলা ঘরের চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে চেয়ারে বসলেন। তারপর আমাকে বললেন, "আমি আপনাকে কাকাবাবু বলে ডাকবো। আপনি আমাকে নাম ধরে তুমি বলবেন। নাম আমার শুভ্রা, এটি আমার ছোট ভাই, অমিতাভ।"

"ভারি সুন্দর নাম তো তোমাদের ? কি পদবী তোমার ?" এক-টুকরো মিষ্টি হেসে শুভ্রা বলল, "আগে ছিল জানা, এখন সামন্ত।"

"তোমার নাম আমি ভুলব না। আমার এক ভগ্নীর নামও শুভ্রা।" "ভুলে গেলেই বা ছাড়ছে কে। আবার মনে করিয়ে দেব।" মিষ্টি হাসি এবার তার ঠোঁটে ভেসে উঠল।

আমি অমিতাভকে বললাম, "তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, চেয়ারে বস।" তারপর শুভ্রাকে বললাম, "দেখতো মেয়েদের কেমন পরিবর্তন? এরই মধ্যে নূতন একটা উপাধি পেয়ে গেছ।"

শুভ্রা সুন্দর ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে বড় বড় চোখে চেয়ে বলল, "ইস্ তাই বুঝি? আপনারা তো বললেন ঐ কথা। রেজাল্ট আউট হলে বাবা আর আমাকে একটা দিনও ভাবতে সময় দিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন।"

"তিনি ঠিকই করেছেন। কতদূর পড়েছ?"

নাক মুখ কুঁচকে শুভ্রা বলল, "কোন রকমে এম.এ-টা পাশ করেছি।"

"কোন রকম নিশ্চয় নয়, ভাল ক'রেই করেছ। কোন সাব্জেক্ট?"

ঘাড় বেঁকিয়ে এক ঝলক হাসির সাথে শুভ্রা বলল, "পলিটিক্যাল সায়েন্সে।"

"সুন্দর, মিঃ জানা তোমাকে ঠিক লাইনেই দিয়েছিলেন।"

ঔৎসুক্য ভরা চোখ চেয়ে শুভ্রা বলল, "বাবার সঙ্গে কাকাবাবুর বুঝি আলাপ আছে?"

"তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই, তবে দীঘা বেড়াতে গিয়ে তাঁর কাজের পরিচয় আমি পেয়েছি।"

শুভ্রা খুশী হ'য়ে বলল, "এবার আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করছি, যেতে হবে কিন্তু?"

"তোমাদের কোন্ বাড়িতে?"

শুভ্রা আমার পরিহাসটা বুঝতে পারল। সলজ্জ হাসির সঙ্গে

বলল, "আগে আমাদের কণ্টাই-এর বাড়িতেই চলুন তো, তারপর ওখান থেকে আপনাকে বাঁকুড়ার বাড়িতে নিয়ে যাব।"

"আচ্ছা তাই হবে। এখন তুমি কেমন আছ? ওষুধে কাজ হ'য়েছে, না অন্য ওষুধ পালটে দেব?"

আমার কথা শুনে শুভ্রা অমিতাভের দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল, "ও আপনি ওষুধ দিয়েছিলেন বুঝি? কাকাবাবু কিন্তু আমাকে সে কথা একেবারে বলে নি। ভালই আছি কাকাবাবু, সেই জন্যই তো বাইরে এলাম। তবে ওষুধটা আর দু'এক ডোজ খেলে মন্দ হয় না?"

"সন্ধ্যার পর অমুর হাতে পাঠিয়ে দেব। এখন বল, কি জন্য এখানে এসেছ?"

"মা ও কাকাবাবু আপনাকে জানিয়েছেন—আপনি যখন যেখানে যাবেন, আমাদের যেন সঙ্গে নিয়ে যান।"

"বেশ, বল—আজ কোথায় যেতে চাও?"

"সে আমি কেমন ক'রে বলব?" শুভ্রা ঘাড় বাঁকিয়ে তির্যক ভাবে আমার দিকে চেয়ে রইল।

তারপর একটুকরো হেসে বলল, "কাকাবাবু, মা কিন্তু আপনার নাম দিয়েছেন ধনকুবের।"

আমি কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কারণ?"

"কাল দুপুরে 'কাশ্মীরী হাউস' থেকে ফিরে এসে মা বললেন, শুভ্রা কাশ্মীরে এসে জ্বর করে পড়ে রইলি। আমরা কি সুন্দর শাল ফ্যাক্টরী দেখে এলাম। আমাদের সঙ্গে এক ধনকুবের ছিলেন, তিনি এক সঙ্গে আটখানা শাল কিনলেন। এখন গিয়ে সেগুলি দেখে আয়। আর সময় মত তাঁর সঙ্গে গিয়ে একদিন শাল ফ্যাক্টরী দেখে আসিস।"

"আমি তো এখন শাল দেখতে ও আজকে আপনার প্রোগ্রাম জানতে এলাম।"

আমি বললাম, "শুভ্রা কেনা শালগুলি সবই বন্ধু বান্ধবের ফরমাইসি। আমি সত্যই খুব গরীব লোক। তুমি বৌদিকে একটু বুঝিয়ে বলো।"

"ছেড়ে দিন, মার কথা। আজ কোথায় আমাদের নিয়ে যাবেন তাই বলুন? হোটেলে বসে থাকতে আমার আর একটুও ভাল লাগছে না।"

"বেশ চল আজ তবে 'নাগিন লেক' দেখে আসি। শিকারা করে যাব কিছু পরিশ্রম হবে না। তাড়াতাড়ি ওঁদের তৈরী হ'য়ে আসতে বল।"

"কাকা তো ঘুমুচ্ছেন দেখে এসেছি। মা শুয়ে বই পড়ছেন ওঁরা আজ আর কোথাও যাবেন না। সে কথা আগেই বলেছেন।"

"তবে তোমরা শাল দেখে দু'জনায় তৈরি হ'য়ে এসো।"

শুভ্রা দাঁড়িয়ে বলল, "কাকাবাবু আপনি তো পালিয়ে যাচ্ছেন না। শাল অন্য একদিন এসে দেখে যাব, আমরা এক্ষুণি আসছি।"

কথাটি বলে খুশীতে উপচে পড়ে অমুর হাত টানতে টানতে ঘরের বার হ'য়ে গেল।

বেলা চারটার সময় ডালে এক শিকারাওয়ালার সঙ্গে তিনটাকায় ফুরন হ'ল। সে নাগিন লেক দেখিয়ে সাতটার সময় আমাদের এখানে পৌঁছে দেবে।

মৃণালবাবু অন্য শিকারায় উঠে ডাল লেকে বেড়াবার জন্য বসেছিলেন। আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি এসে সঙ্গ নিলেন।

শুভ্রার উৎসাহ যেন সকলকে ছাপিয়ে গেছে। বেচারা কাল সারাদিন হোটেলে বন্দী জীবন কাটিয়েছে।

শিকারার ভিতর শাল জড়িয়ে বসে খুশীতে ভরপুর হয়ে বলল, "কি মজা!" স্বপ্নার সঙ্গে এরই মধ্যে দিব্যি আলাপ করে নিয়েছে। বলল, "পিসি দাঁড়িয়ে দেখছ কি? কাকাবাবুকে ডেকে তুমি ভিতরে এসে বস, বাকি সকলে ওঁরা বাইরে বসুন।"

মৃণালবাবু স্বপ্নাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "বৌদি, আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলেন, অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়।" রূপেনকে দেখিয়ে বললেন, "কিন্তু আমার এ দাদাটি কি অপরাধ করলেন? কাশ্মীরের মত জায়গায় বেড়াতে এসে ভাসুর ভাদ্রবৌও এত ছুঁৎমার্গ মেনে চলেন না।"

শুভ্রা ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, "পিসি তোমার লক্ষ্মণ দেবরটি দেখছি ভ্রাতৃ দুঃখে মর্মাহত। দ্রাক্ষাফল যে টক্ এটা তার বহু পরীক্ষিত।"

স্বপ্না হেসে ফেলল, রূপেন ও অমু তাতে যোগ দিল।

আমি বললাম, "শুভ্রা তুমি মৃণালবাবুকে চেন দেখছি?"

"না চিনে উপায় আছে কাকাবাবু? আসবার সময় সারা রাস্তা ট্রেণে যা করে এসেছেন? ব্রজবাসীদের যেমন 'কানু' ছাড়া নাম নেই, ওঁরও তেমনি বৌদি ছাড়া আর বুলি নেই।"

স্বপ্না বলল, "তোমাকে তো বাপু আর বৌদি বলে নি।"

"চেষ্টার ত্রুটি ছিল না পিসি, কিন্তু ট্রেণ জার্নির জন্য আমার চুলগুলো উস্কুখুস্কু থাকায় সিঁথির সিঁদুর আর লক্ষ্যে পড়ে নি, তাই রক্ষে।" শুভ্রার কথায় সকলেই হাসল।

আমি বললাম, "খারাপ কি? আমাদের দেশে মার পরই তো বৌদির স্থান, ভারি মধুর সম্পর্ক। পৃথিবীর অন্যস্থানে এ দৃশ্য দেখা যায় না বড় একটা।"

শুভ্রা মৃণালবাবুর দিকে চেয়ে, বলল "আহা বেচারা রে, কতদিন যে ফেউ-এর মত বৌদিদের পিছনে ঘুরতে হবে তা কে জানে।"

তার কথায় সবাই আবার হো হো করে হেসে উঠল।

শিকারা শন শন শব্দে এগিয়ে চলেছে। সুসজ্জিত রঙিন ঝালর বাতাসে ফট্ ফট্ শব্দে উড়ছে।

মৃণালবাবু স্বপ্নাকে বলল, "আমি এবার থেকে কিন্তু ওঁকে বৌদি বলে ডাকব।"

স্বপ্নার কিছু বলার আগেই শুভ্রা হাতে একটা বৈঠা উঠিয়ে বলল, "পিসি তাহলে তোমার দেবরকে আমি ঠিক দাঁড় পেটা করবো।"

মৃণালবাবু বললেন, "ইস্ তাহলে শিকারা ডুবিয়ে দেব না?"

"বয়েই গেল। কাঁথির মেয়ে আমি। দীঘার সমুদ্রে সাঁতরে আমার হাতেখড়ি। কলকাতার বাবু নিজেই সীসের মত টুপুস ক'রে জলে ডুবে মরবেন?"

আবার সকলে হেসে উঠল।

অমু বলল, "দিদির সঙ্গে সাঁতারে ছেলেরাই পারে না—যা স্পীডি?"

স্বপ্না বলল, "আচ্ছা এবার আপোষ ক'রে নাও তোমরা দু'জনায়, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। মাঝখান থেকে আমরা ফ্যাসাদে পড়ব।"

হরতনের টেক্কার মত বৈঠা দ্রুত উঠানামা ক'রে জল কাটছে।

শিকারা বহুক্ষণ হল ডাল লেক ছেড়ে দিক পরিবর্তন ক'রে এগিয়ে চলেছে।

কাশ্মীরীরা ছিপে ট্রাউট মাছ ধরছে দেখে মৃণালবাবু বললেন, "বৌদি কিনবো না কি?"

"না না ঠাকুরপো, ও সব ঝঞ্ঝাটে কাজ নেই এখন।"

শুভ্রা বলল, "স্টোভ সঙ্গে থাকলে ভাল হতো।"

এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা নাগিন লেকে এসে গেলাম। জলের রং গেছে বদলে। যেমন স্বচ্ছ তেমনি পরিষ্কার। সকলেই সমস্বরে বলে উঠলো, "কি সুন্দর দৃশ্য।"

দূরে হাত দেখিয়ে শুভ্রা বলল, "হাউসবোটগুলি দেখুন কাকাবাবু, কত সুন্দর দেখতে, আবার পাল তোলা জাহাজের মত কি যেন দেখা যাচ্ছে?"

স্বপ্না বলল, "জলের রং ঠিক সমুদ্রের মত, নিশ্চয়ই সুগভীর।

আচ্ছা দাদা এর আগে তো কারুর কাছে নাগিন লেকের নাম শুনি নি? লোকে তো ডাল নামেই পাগল।"

"ডাল রাস্তার ধারে, ও আয়তনে বড়। সামনেই ডালকে দেখা যায়। নাগিন লেক তো দূরে আছে। তবে সাঁতারের প্রতিযোগিতা, স্নান করা প্রভৃতি এখানে হয়। এমন জল পাবে কোথা?"

শুভ্রা বলল, "কাকাবাবু ডালের আয়তন কত বড়?"

"তা প্রায় বার বর্গমাইল বিস্তৃত হবে।"

"ওরে বাবা, এত বড়? আর নাগিন?"

"নাগিন এক বর্গমাইলের হয়তো কিছু বেশি হবে।"

স্বপ্নার ইঙ্গিতে পিছনে চাইতে হ'ল। দেখি মিঃ দাঁ-এর শিকারা আমাদের ঠিক পাশ দিয়েই চক্র খেল। আমাদের শিকারাও ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে চলল।

জলে কাশ্মীরী ভাইদের পণ্য বোঝাই শিকারাগুলি একে একে আমাদের সামনে এসে কিছু কেনবার জন্য কত অনুরোধ জানিয়ে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে যাচ্ছে। কাশ্মীরী বোনেরা মধ্যে মধ্যে দাঁড় বেয়ে আনমনে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ আমাদের সঙ্গে তাদের দৃষ্টি বিনিময় হলে প্রতিদানে মিষ্টি হাসি ছাড়িয়ে গন্তব্য পথে এগিয়ে চলেছে।

স্বপ্না বলল, "ঠাকুরপো, কাল রাতে দাদার কাছে কাশ্মীরী মেয়েদের নিয়ে তো খুব কাব্য করছেন, আচ্ছা এবার এদের রূপ বর্ণনা করুন তো শুনি?"

"আপনার ভাইঝি আবার বৈঠা পেটা করবেন না তো?"

আমরা সকলে হাসলাম। শুভ্রা বলল, "না অভয় দিচ্ছি।"

মৃণালবাবু কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস টেনে বললেন, "তবে বলি শুনুন। এরা দীর্ঘাঙ্গী, স্বাস্থ্যবতী, গৌরবর্ণা লালাভ কপোল, গোল ও ঈষৎ লম্বাটে মুখাকৃতি, উন্নত নাসিকা, সুর্মাপরা, বৃহৎ আয়ত লোচন, যুক্ত ভুরু, প্রশস্ত কপাল ও কুঞ্চিত কেশ বেণীবদ্ধ।"

শুভ্রা হাসতে হাসতে বলল, "উপমায় কালিদাস শুদ্ধ।" আবার হাসির রোল উঠল।

স্বপ্না চুপি চুপি বললে, "দাদা হাউসবোটে উঠে দেখা যায় না?"

শুভ্রা বললে, "ওরা তো কাকাবাবুকে দেখবার জন্যে ক'জনায় মিলে কত সাধাসাধি করল। কাকাবাবু এবার আপনাকে কেউ দেখতে চাইলে রাজী হয়ে যাবেন।"

রূপেন বলল, "আমার ধারণা ছিল কাশ্মীরে সকলেই হাউসবোটে বাস করে।"

আমি বললাম, "তোমার ধারণাটা আংশিক সত্য। স্থানীয় লোকেরা খুব গরীব। আর কাঠ এখানে খুবই সস্তা, সুতরাং নিজেরাই ছোটখাটো একটা হাউসবোট তৈরি করে নেয়। তাতে বাস করাও চলে আবার পণ্যদ্রব্য বেচে জীবিকার্জনও হয়।"

"কিন্তু দাদা এসব হাউসবোট তৈরি করতে রীতিমত টাকা খরচা হয়েছে।"

এগুলি পর্যটকদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি যে। স্থানীয় ধনীদের এ একরকম ব্যবসা। ঠিক আমাদের দেশের ট্যাক্সি বা বাস মালিকদের মত।"

শুভ্রা বলল, "প্রত্যেক হাউসবোটেরই কিন্তু এক একটি পৃথক নাম আছে।"

স্বপ্না বলল, "শুধু হাউসবোটের নয়, শিকারাগুলিরও পৃথক নাম আছে।"

শুভ্রা বলল, "তাই নাকি? আচ্ছা আমাদের এটির কি নাম?"

অমু বলল, "নূরজাহান।"

"বাঃ সুন্দর নাম তো?"

একটি জমকালো হাউসবোটের কাছে আসতেই তার অধিবাসীরা আমাদের সকলকেই উঠে দেখবার জন্য অনুরোধ করলেন।

আমরা প্রস্তুত ছিলাম। একে একে সকলে হাউসবোটে উঠে পড়লাম।

এঁরা উর্দু ও ইংরাজী মোটামুটি বলতে ও বুঝতে পারেন। ছাদের উপরে ফুলবাগানে বসিয়ে আমাদের চা-পানের অনুরোধ করলেন।

স্বপ্না বলল, "আমরা চা খেয়েই এসেছি। আগে আমাদের হাউসবোট দেখিয়ে দিন। পরে চা-পানের কথা হলেও চলবে।"

রূপেন বলল, "সেই ভাল এখন চায়ে প্রয়োজন নেই।"

এঁদের এক ভদ্রলোককে ডেকে আমি বললাম, "হাউসবোট দেখবার আগে যদি আমাদের মোটামুটি কিছু বুঝিয়ে দেন তো ভাল হয়।"

ওঁরা ভিতর থেকে জাহাঙ্গীর নামে এক ভদ্রলোককে ডেকে আনলেন। সে ভদ্রলোক এসে আমাদের সেলাম করে ইংরাজীতে বলতে শুরু করলেন, "বসবাসের জন্য এই ধরণের বড় বোটকে হাউসবোট বলে। আর সর্বদা জলে চলাফেরা করবার জন্য আপনারা যাতে চড়ে এসেছেন, এই রকম বোটকে 'শিকারা' বলে। হাউসবোটকে আপনাদের দেশে নদীতে চলবার ফ্লাট ও শিকারাকে পান্‌সি নৌকার সঙ্গে খানিকটা তুলনা করতে পারেন। প্রত্যেকের পৃথক নাম ও নম্বর আছে। হাউসবোটগুলি নানান মাপের। আমাদের এটি একশো ফুট লম্বা ও বিশ ফুট চওড়া। 'এ' 'বি' 'সি' এই তিন শ্রেণীর। আমাদের এই বোটটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত। বিদেশী আভিজাত্যপূর্ণ পর্যটক বা রাজ-রাজড়া এগুলি ভাড়া করেন। দু'জন লোকের বসবাসের মত ব্যবস্থা আছে। সাত আট জনও থাকতে পারেন। দৈনিক ভাড়া একশত টাকা।"

মৃণালবাবু প্রশ্ন করলেন, "একশো টাকা কি কেবল থাকবার জন্য দিতে হয়?"

"না মহাশয়, দু'জনের থাকা খাওয়া যাবতীয় খরচা। তবে গার্ল এনে নাচ গান বা ড্রিঙ্ক করলে তার খরচা আলাদা লাগে। যে কোন বড় সহরের প্রথম শ্রেণীর হোটেলের মত এতে সব রকম বিলি ব্যবস্থা ও সুখ সুবিধা আছে।"

রূপেন জিজ্ঞাসা করল, "এ বা বি শ্রেণীতে কি রকম ভাড়া ?"

"পঞ্চাশ, পঁচিশ যার যেমন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সর্বাপেক্ষা সস্তা বোটের ভাড়া কি রকম ? যদি কেউ নিজেরা রান্নার ব্যবস্থা করে নেয় ?"

"দৈনিক পাঁচ ছয় টাকায়ও বোট পাওয়া যায়। তবে সেগুলি কোন শ্রেণীভুক্ত নয়, তাদের লাইসেন্স নেই।" তারপর বললেন, "এবার আমার সঙ্গে আসুন, ভিতরটা দেখিয়ে দিই।"

আমরা সকলে তাকে অনুসরণ করলাম। প্রথম ঘরে এসে ভদ্রলোক বললেন, "এটি বৈঠকখানা।" ঘরটি তক্‌তকে্ ঝক্‌ঝকে্, সুরুচিপূর্ণ আসবাবে পূর্ণ। রেডিও, ঘড়ি, ফোন, গ্রন্থাগার প্রভৃতি সব কিছুই আছে। তারপর পাশাপাশি দু'টি ঘর দেখিয়ে বললেন, "এ দু'টি শোবার ঘর, এ ঘরও মূল্যবান ও সৌখিন বিলাস দ্রব্যে পরিপূর্ণ। দামী কার্পেট, গদি, তোষক, কম্বল প্রত্যেকটি পরিপাটি ভাবে সাজান। বেডস্যুইচ, কলিংবেল, ইত্যাদি সবই পাবেন।"

তারপর খাবার ঘর, স্নান ঘর, ড্রেনেজ পায়খানা, ও ভৃত্যদের ঘর ইত্যাদি দেখিয়ে দিলেন।

দেখা শেষ হলে আমরা পুনরায় ছাদের উপর ফুলবাগানে ফিরে এলাম। জাহাঙ্গীর বললেন, "এখানে বসে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য অপূর্ব লাগে। তাছাড়া চাঁদনী রাতে ডাল এক অপরূপ সুষমায় ভরে যায়। সে দৃশ্য চোখে না দেখলে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।"

ভদ্রলোক আবেগে বলে চললেন, "আভিজাত্যপূর্ণ ভ্রমণ বিলাসী পর্যটক দল প্রায়ই শ্রীনগরে এসে এই হাউসবোটে স্বপ্ন সৌধ রচনা করে দিনের পর দিন স্বর্গের সুধা পান করেন।

"তরুণ-তরুণী, বন্ধু-বান্ধবী, প্রেমিক-প্রেমিকা ও সদ্যবিবাহিত দম্পতী হনিমুনে, কিংবা প্রমোদ ভ্রমণে এসে কাশ্মীরের সৌন্দর্য মাধুরী উপভোগ করে বিলাসের বন্যায় ভেসে যান।

"আমাদের নীড় তখন স্বর্গের সুরভিতে ভরে যায়। আমরাও তখন রঙিন উৎসবের আনন্দ স্রোতে ভেসে যাই। পর্যটকদের সাহচার্য পেয়ে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করি। এই আমাদের রুজী রোজগারের একমাত্র পথ।"

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা একে একে আমাদের শিকারায় নেমে এলাম। শিকারা ছেড়ে দিল। আমাদের পুনরায় আসবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে তাঁরা বার বার সেলাম দিলেন।

স্বপ্না বলল, "হাউসবোটটি যেন স্বর্গপুরী।"

রূপেন বলল, "হবে না কেন? রোজ দু'জনকার একশো টাকার ধাক্কা কি কম!"

মৃণালবাবু বললেন, "তালিকা ছাড়া কিছু ফরমাস করলে আবার বাড়তি দিতে হয়।"

শুভ্রা বলল, "জলের মধ্যে কি সুন্দর দ্বীপ দেখ পিসি!"

রূপেন বলল, "শুধু দ্বীপ নয় তার মধ্যে আবার সব্জী ক্ষেত!"

আমি বললাম, "সত্যি, কপি টম্যাটো বেগুন লঙ্কা কিছুই বাদ নেই। এমন কি এখানে উচ্ছে পটলও পাওয়া যায় শুনেছি।"

"ওমা বলেন কি?" স্বপ্না অবাক হয়ে চাইল।

রূপেন বলল, "ঐ দেখ না, জলের উপর মাচার ফাঁকে লাউ ও কুমড়ো ঝুলছে।"

স্বপ্না বলল, "এধারে দেখ, কেমন আঁকাবাঁকা জল দিয়ে ঘেরা পল্লী।"

শুভ্রা বলল, "সত্য তো পিসি, কি মজা।"

মৃণালবাবু বললেন, "একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা, চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।"

অমু হাততালি দিয়ে বলল, "এইতো দিব্যি কমপ্লিমেন্ট দিয়েছেন।" সকলে হেসে উঠল।

একটি মন্দির দেখে মৃণালবাবু শিকারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওটা কিসের মন্দির ?"

"ও সব পণ্ডিতদের।" কথাটি বলে বসির চুপ করে গেল।

আমি বললাম, "ওরা ব্রাহ্মণদের পণ্ডিত বলে।"

স্বপ্না বলল, "দাদা এই দ্বীপে সকলে মিলে পিক্‌নিক্ করলে হয় না ?"

শুভ্রা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "দি গ্রাণ্ড আইডিয়া পিসি!"

আমি বললাম, "অনেক অসুবিধা আছে।"

স্বপ্না বলল, "সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে এতদূর আসার একটু অসুবিধা আছে। তাছাড়া আপনাদের একটু পরিশ্রম হবে।"

রূপেন বলল, "সে কথা নয়। জল পাবে কোথায় ?"

"তুমি যে ভাবে কথা বলছ, তাতে মনে হয় আমরা যেন প্লেনে চলেছি।"

রূপেন হেসে বলল, "আমার কথাটা তুমি ঠিক ধরতে পার নি, শুনলে না বিশেষশ্রেণীর হাউসবোটে ড্রেনেজ সিস্টেম্ আছে ?"

স্বপ্না আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল।

আমি বললাম, "শুধু তাই নয়, অন্য হাউসবোটের কমোডের ময়লাও ডালের জলে ফেলে। এ জলে হাত দিতে ঘৃণা করে।"

"রাম বলুন, অতশত ভেবে আমি বলি নি।"

মৃণালবাবু তাল পেয়ে ভেংচি কেটে শুভ্রাকে বলল, "দি গ্রাণ্ড আইডিয়া পিসি।"

আমরা এবার সকলে হেসে উঠলাম।

হঠাৎ একটি দোলা খেয়ে চেয়ে দেখি সেলিম একটা দ্বীপে শিকারাটা ভিড়িয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "এ কোথায় আমাদের নিয়ে এলে?"

বসির বলল, "হাঁসনাবাদ, সাহেব।"

"কেন এখানে কি আছে?"

"পেপার মাসি দেখবেন না?"

"সে আবার কি? কত দূরে?"

সেলিম বলল, "নামুন না সাহেব, বেশি দূর হবে না। দেখলে খুশী হবেন। কাশ্মীরে এলে সকলেই দেখে যান।"

রূপেন বলল, "চলুন দাদা দেখে আসি। এখন তো সাড়ে পাঁচটা। সন্ধ্যার অনেক দেরী আছে।"

স্বপ্না বলল, "নেমে দ্বীপের মধ্যে পল্লীটা তো দেখা যাক।"

শুভ্রা বলল, "যা হয়—যথা লাভ।" তিন-চার মিনিটের পথ, আমরা সেলিমের সঙ্গে পাড়ার মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসে এক আঙ্গিনায় উঠলাম।

সেলিম এক প্রিয় দর্শন যুবককে বাড়ির মধ্যে থেকে ডেকে এনে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বলল, "সাহেব, ইনিই আলি সাহেব।"

আলি সাহেব সাদরে আমাদের ঘরের মধ্যে আনলেন। স্বপ্না ও শুভ্রাকে আগে চেয়ারে বসিয়ে আমাদেরও বসতে অনুরোধ করলেন। তারপর কাগজের মণ্ড হাতে নিয়ে অতি অল্প সময়ে একটি কাস্কেট তৈরী ক'রে দেখালেন।

কিছুক্ষণ পরে আলি সাহেব আমাদের উপরে এনে তাঁর হাতের বিভিন্ন রকমের বহু দ্রব্যাদি দেখাতে লাগলেন।

ভদ্রলোকের অদ্ভুত পরিকল্পনা! অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্যপ্রিয়তা, অপূর্ব শিল্প সম্ভার আমাদের মুগ্ধ করেছে। আমরা অনিমেষে অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখছি।

রূপেন নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছে। ভদ্রলোক হাতে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা ক'রে শোনাচ্ছেন তাঁর শিল্প দক্ষতা।

কয়েকটি তুলি হাতে উঠিয়ে বললেন, "এগুলি বন্য বিড়ালের লোম, ও হাঁসের পালকের সাহায্যে স্বহস্তে তৈরী। পাহাড়ে গিয়ে রকমারি পাথর সংগ্রহ ক'রে আনি, তাই গুড়িয়ে এ সব রং তৈরী করেছি। আর পরিত্যক্ত পুরান কাগজ ও অব্যবহার্য কাপড়ের টুকরো যা কাজে লাগে না তাই দিন পনেরো জলে ভিজিয়ে মাড়ের সাহায্যে এই মণ্ড তৈরী।"

বাস্তবিক এই সামান্য উপাচার থেকে কত বিচিত্র ধরণের রঙিন চিত্র, খেলনা, বিলাস ও প্রসাধন দ্রব্য তৈরী সত্যই বিস্ময়কর। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ভদ্রলোকের পারস্য ও মোগলশিল্প সংমিশ্রণে স্বহস্তে রচিত রঙিন ওমরখৈয়ামের চিত্রগুলি জীবন্ত।

এগুলি দেখে ত্রিবান্দমে চিত্রশালায় রক্ষিত রবি বর্মণের আঁকা মূল চিত্রগুলি আমায় স্মরণ করিয়ে দেয়।

স্বপ্না ও শুভ্রাকে অতি যত্ন সহকারে আলি সাহেব খুঁটিয়ে সব জিনিস ইংরাজীতে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। মধ্যে মধ্যে যথাযথ ভাবে বাংলা কথাও তাতে যোগ করছেন।

স্বপ্না এবার বাংলায় প্রশ্ন করল, "আচ্ছা আলি সাহেব, এই সব রং-ই কি আপনার নিজের হাতের তৈরী?"

আলি সাহেব বাংলায় বললেন, "না দিদি, সোনালি রং বিদেশ থেকে আনতে হয়।"

"আর ঐ তুলিগুলি?"

"এগুলিও এখানকার নয়। বহির্ভারত থেকে আনিয়েছি।"

স্বপ্না আমার দিকে চেয়ে একটুকরো হাসল। আলি সাহেবের লক্ষ্যে সেটা এড়াল না। তিনি কৌতূহলী হয়ে আমাদের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

আমি বললাম, "আলি সাহেব, ওঁর স্বামী মিঃ মুখার্জীও শিল্পী। এক সময় উনি ছবি আঁকতেন। সে জন্য রং ও তুলি সম্বন্ধে এঁদের কিছু অভিজ্ঞতা আছে।"

কথাটি শেষ হ'লে আলি সাহেব রূপেনের হাত ধরে খানিকটা নাড়িয়ে দিলেন। তারপর আলমারি খুলে একটি ছবি বার ক'রে রূপেনের সঙ্গে আলো ও ছায়ার পার্থক্য নিয়ে খুঁটিনাটি রেখার আলোচনা সুরু করলেন।

স্বপ্না আমার গায়ে হাত দিয়ে ওঁদের দেখিয়ে চুপিসারে বলল, "তু'জনা এবার একেবারে তন্ময় হ'য়ে জমে গেছেন।"

ক্রমশঃ এখানে বেশ ভিড় জমে গেল। ক্রেতাদের জিনিস দিয়ে দাম নিতে হচ্ছে। কাউকে বা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। এরই মধ্যে আলি সাহেব ছোট একটি ঘরের মধ্যে কতক-গুলি আসবাব সজ্জা দেখিয়ে বললেন, "এগুলি আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়ের ফরমাস দেওয়া।"

আমরা তো অবাক ? স্বপ্না প্রশ্ন করল, "আলি সাহেব এগুলির দাম কত হবে।"

"তা প্রায় ছ'হাজার টাকার মত।" কথাটি বলে একটি প্রশংসা পত্র এনে আমাদের সামনে মেলে ধরলেন।

আমরা তাঁর প্রশংসা পত্র পড়ে বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। এ যে আমাদের শ্যামাপ্রসাদবাবুর হস্তাক্ষর।

আলিসাহেব গভীর দুঃখে বললেন, "ডাঃ মুখার্জীর অকালমৃত্যুতে

আমার অপূরণীয় ক্ষতি হ'য়েছে। বহুক্ষেত্রে আমি তাঁর প্রত্যক্ষ সাহায্য পেয়েছি। আমার অদৃষ্ট মন্দ।"

অতি অল্প সময়েই আলি সাহেবের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হ'য়ে গেল। স্বপ্না, শুভ্রা ও রূপেনকে আলি সাহেব বিশেষভাবে আকৃষ্ট ক'রেছেন।

শ্যামাপ্রসাদবাবুর আকুণ্ঠ সুখ্যাতি ও কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য বিদায়ের সময় আমাদের মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল।

মনের গতিবিধির যাঁরা খবর রাখেন অন্ততঃ তাঁদের কাছে এটা অজানা নয় যে, এই ঠুনকো জিনিসটি কত সহজে ও সামান্য আঘাতেই না ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যায়! আবার সময়ে এতই কঠিন হয়ে পড়ে যে তখন তাকে কিছুতেই আঘাত করা যায় না। দরদী হৃদয় পেলে মনের কপাট অতি অল্প সময়ে খুলে যায় ও পরকে আপন করে নেয়। তাই ভালবাসায়, সৌন্দর্যবোধে তাকে কেউ কোনদিন শ্রেণী বা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করতে পারে নি। ধর্ম, জাত ও ভাষার বিভিন্নতার গণ্ডী ছাড়িয়ে সে মিলিত হ'য়েছে গভীর সখ্যতায়—বিশ্ব-ভ্রাতৃপ্রেমে।

আলি সাহেব নীচে নেমে দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের সহিত আন্তরিকতা দেখিয়ে বিদায় নিলেন। রূপেনকে আবেগে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তবু দুটো কথা বলবার লোক পেলাম বাবু সাব। দয়া করে আবার আসবেন।"

আমি সকলের শেষে চলেছি। এবার আমার পালা। বহুক্ষণ তাঁর সময় নষ্ট করেছি। অথচ কোন জিনিসই আমরা কিনতে পারি নি। পছন্দমত জিনিসের মূল্য আমাদের ক্রয় সামর্থ্যের বাইরে। তাই এ সহজ সত্য কথাটি অকপটে স্বীকার না করে থাকতে পারলাম না।

তাঁকে বললাম, "আলি সাহেব অত্যাশ্চর্য শিল্প সম্ভারের সাথে

আপনার অমায়িক সুমধুর ব্যবহারে আমরা সকলেই মুগ্ধ। ভাষার দ্বারা এর মর্মার্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্বেও উচিত মূল্য দিয়ে এখানকার কোন জিনিসই ক্রয় করা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে। আমার মনে হয় অধিকাংশ দর্শকদের আমাদের মত অবস্থা।

"সত্যকার সাহিত্যিক, কবি, বা শিল্পী জীবিত অবস্থায় তাঁর যোগ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত থাকেন। ভগবানের নিকট আমার আন্তরিক প্রার্থনা আপনার এই প্রতিভার যোগ্য পুরস্কার দিয়ে বিধাতা যেন আপনাকে জীবিত অবস্থায় শিল্পীর শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে দেন।"

আমার কথা শেষ হতেই আলি সাহেব মুগ্ধ বিস্ময়ে আবেগে আমার দুহাত জড়িয়ে ধরে বললেন, "আমি আপনার ব্যবহারে অভিভূত ও ধন্য। এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। এই অপার্থিব মূল্যের কথা কেউ কোনদিন আমাকে বলেন নি। ঈশ্বরের দয়ায় আজ আমি আমার পরিশ্রমের যোগ্য পুরস্কার পেলাম।"

তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। প্রীতিপূর্ণ বড় বড় চোখ তুলে আমার দিকে চাইলেন! আমরা কথা বলতে বলতে ঘাটে এসে গেলাম। সকলেই একে একে শিকারায় উঠলেন ও হাত তুলে আলি সাহেবকে বিদায় জানালেন।

আমিও বিদায় নেবার জন্য হাত তুললাম। তিনি আমার হাত নাড়িয়ে বললেন, "দেশে ফিরে আপনার পত্র পেলে আমার হাতের ক্ষুদ্র শিল্পনিদর্শন প্রীতিচিহ্ন হিসাবে আপনাকে পাঠিয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো। আমার নাম জাফর আলি—হাঁসনাবাদ, শ্রীনগর, কাশ্মীর।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরের দিন সকাল নয়টায় হোটেল ম্যানেজারের ব্যবস্থায় আমরা রিজার্ভ বাসে 'গুলমার্গ' দেখতে রওনা হলাম। সুন্দর বাসটি। শ্রীনগর পিছনে ফেলে পপলার ও চিনার গাছের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলল বাস। কিছুদূর আসার পর বাসটি চড়াইয়ে উঠতে শুরু করল। এইভাবে চব্বিশ মাইল রাস্তা পার হয়ে বেলা সাড়ে দশটায় শ্রীনগরের ঠিক খাড়া পশ্চিমে 'টাঙ্গামার্গ' পৌঁছল। বাস থেকে নেমে সকলে খুশী মনে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লাম। শুভ্রা বলল, "বাঃ ছোট্টখাট্ট ভারি সুন্দর সহর তো।"

স্বপ্না বলল, "সত্যই তাই, আবার রেষ্ট হাউস ও গুটিকয়েক হোটেলও আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি রিজার্ভ বাস ও একটি সাধারণ বাস আসাতে জায়গাটি সরগরম হয়ে উঠল।

আমরা শুভ্রা, স্বপ্না ও বৌদির জন্য তিনটি ঘোড়া ভাড়া করে বাকিগুলো অন্য মহিলাদের জন্য ছেড়ে দিলাম। আমাদের বদান্যতার সুযোগ কয়েকজন ভদ্রলোক নিয়েছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘোড়াগুলি ভাড়া করা হয়ে গেল।

স্বপ্না ও শুভ্রা আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে রওনা হ'ল।

মিঃ দাসের শিলং-এ জন্মভূমি। তিনি পাকা সওয়ারির মত স্ত্রী পুত্র ও কন্যার সাথে গুলমার্গের দিকে ঘোড়া ছোটালেন।

আমরা হাঁটা পথে চলতে সুরু করলাম। পথে বর্ধমানের প্রখ্যাত এ্যাডভোকেট মিঃ ঘোষের সঙ্গে দেখা। তিনি স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে ঘোড়ায় চলেছেন। ভদ্রলোক খুব আলাপী ও বিনয়ী। আমাদের সঙ্গে এরই মধ্যে বেশ হৃদ্যতা হ'য়েছে!

তিনি বললেন, "মিঃ চ্যাটার্জি কেন ঘোড়া নিলেন না? একসঙ্গে বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যেত।"

মিসেস ঘোষ টিপ্পনী কাটলেন, "মিঃ চ্যাটার্জি তো বুড়ো হন নি, অপরের সাহায্য কেন নিতে যাবেন?"

মিঃ ঘোষ বললেন, "শুনলেন তো মিঃ চ্যাটার্জি, স্রেফ্ আমাকে টার্গেট?"

মিসেস ঘোষ ঠোঁটে হাসি চেপে বললেন, "এত বড় ফ্যাসাদ, সব কথায় তুমি গায়ে পেতে নিলে চলে কেমন ক'রে?"

আমি বললাম, "ভাল ঘোড়াগুলি মেয়েদের ছেড়ে দিয়ে আমরা হেঁটে যাওয়াই সাব্যস্ত করলাম।"

ওঁরা এগিয়ে গেলেন। অমু, রূপেন ও মৃণালবাবু বেশ জোরেই হাঁটছেন। আমি ওঁদের পিছনে চলেছি। শশীবাবু তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের সঙ্গে হাঁটা পথে আসতে পিছিয়ে পড়েছেন। কাঁচা রাস্তায় পাথরের উপর দিয়ে আমরা হেঁটে চড়াইয়ে উঠছি। চারদিকেই পাইন ও ঝাউয়ের বন। বহু নীচে নদীর কল্লোল শোনা যাচ্ছে।

রূপেন একটি ছাওয়া দেখিয়ে বলল, "দাদা এখানে উইলো ও শিষমের ছাওয়ায় কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেওয়া যাক।"

আমি বললাম, "মন্দ কি? ঘাম বেরিয়ে গেছে এইটুকু আসতে।"

আমরা বসলে মৃণালবাবু ব্যাগ থেকে আপেল বার করে ছাড়াতে লাগলেন। তারপর টুকরো ক'রে আমার হাতে দিলেন।

আমি খুশী হ'য়ে আমার পকেট থেকে আমলকির মত ছোট কতকগুলি অম্ল-মধুর আপেল ওদের খেতে দিলাম। এগুলি বিনি পয়সার টাঙ্গামার্গ থেকে সংগ্রহ করা।

রূপেন বলল, "দাদা আর কয়েকটি দিন, এগুলো এখন বেশ লাগছে খেতে।"

অমু ও মৃণালবাবু টক আপেলের জন্য আমার কাছে হাত পাতলেন। আমি পকেট খালি করে সবগুলি ওঁদের হাতে দিলাম।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে আবার আমরা চলতে সুরু করলাম।

ওঁরা তিনজনায় পাহাড়ের গা বেয়ে ঝাউবনের ভিতর দিয়ে সোজা চড়াইয়ে উঠে বিশ্রাম করছেন। আমি ঘুরপাক খেয়ে উপরে এসে ওঁদের সঙ্গে মিললে ওঁরা উঠে আবার চললেন।

হাঁটু পর্যন্ত ময়লা আলখাল্লা পরে কান পর্যন্ত কালো টুপী এঁটে একজন কাশ্মীরী মেষপালক ভেড়া ও ছাগলের পাল নিয়ে রাস্তা পেরিয়ে যেন বন থেকে বনান্তরে লুকিয়ে লুকিয়ে চলল।

ভেড়ার লোমগুলি ছাঁটা। কিন্তু দুধে সাদা ছাগলের লোমগুলি ঠিক রেশমের মতই সুন্দর। শুনেছি এই রকম ছাগলের লোম থেকে সুন্দর শাল তৈরী হয়।

মৃণালবাবু বললেন, "দাদা আমরা ৮৭০০ ফুট উপরে এসে গেছি।"

"কে বল্লে? গুলমার্গ তো ৮৫০০ ফুট।"

অমু হেসে ডানদিকে বনবিভাগের বিজ্ঞাপনে লেখা দেখাল।

মৃণালবাবু বললেন, "হ্যাঁ দাদা এবার ২০০ ফুট নেমে গেলেই গুলমার্গ।" অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা গুলমার্গ এসে গেলাম।

রূপেন বলল, "আমরা বেশ জোরেই হেঁটেছি। চার মাইল চড়াই রাস্তা আসতে দু'ঘণ্টার কিছু বেশি সময় নিয়েছে।"

অমু বললে, "শীতকালে গা দিয়ে ঘাম ছুটে গেছে তেমনি।"

মিসেস দাসের সঙ্গে দেখা হ'লে, জিজ্ঞাসা করলাম, "মিঃ দাস কোথায় ?"

" উনি এতক্ষণে সপুত্র খিলানমার্গ পৌঁছে গেছেন।"

"হটাৎ আপনিই বা গোত্রছাড়া হয়ে পড়লেন কি ক'রে ?"

"রক্ষা করুন—ঘোড়ার পিঠে গুলমার্গ আসতেই প্রাণান্ত পরিশ্রম হ'য়েছে। তাছাড়া নমিতা আর যেতে চাইল না।"

স্বপ্না ও বৌদির ঘোড়া নিয়ে রূপেন ও মৃণালবাবু খিলানমার্গ চলে গেলেন। আমি মিসেস দাস ও নমিতাকে ডেকে বৌদির সঙ্গে গুলমার্গ হোটেলে এলাম। হোটেলটি এক শিখ ভদ্রলোকের।

আমরা স্বচ্ছ নীল আকাশতলে ক্লান্তিভরা দেহ আরাম চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

শুভ্রা প্রশ্ন করল,"পিসি, কাকাবাবুকে কফির সঙ্গে কোন্ বিস্কুট দেব ?"

"নোনতা ও মিষ্টি দু'রকমই দিয়ে দাও। এতটা পথ হেঁটে পেটে আর কিছুই নেই।"

আমি হাসলাম। স্বপ্না কফির কাপ এগিয়ে দিল। শুভ্রা বিস্কুট দিল।

মিসেস দাস প্রশ্ন করলেন, "মিঃ চ্যাটার্জি কালকে আমাদের প্রোগ্রাম কি।"

অমু বলল, "প্রোগ্রাম এখন আর কাকাবাবুর হাতে নেই। হোটেলের ম্যানেজারই সব দেখবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।"

বৌদি বললেন, "এ এক দিক দিয়ে ভালই হয়েছে। বাসে এক সঙ্গে গল্প করতে করতে আসা যাবে। আর তাতে খরচও কম লাগবে।"

স্বপ্না বলল, "কাল আমাদের শোনমার্গ যাওয়ার কথা আছে না দাদা ?"

"হ্যাঁ, ম্যানেজার সাহেব সেই রকমই আভাস দিয়েছেন।"

কফি খেয়ে শুভ্রা বলল, "চলুন কাকাবাবু, এবার আমারা নীচে নেমে ঐ দিককার হোটেলগুলি দেখে আসি।"

আমি বৌদি ও মিসেস দাসের দিকে তাকালাম। বৌদি ও মিসেস দাস বললেন, "আপনারা যান, আমরা এখানেই বিশ্রাম করি। এদিকে আবার তো ফেরবার সময় হয়ে এলো।"

আমরা নীচের স্তরে নেমে এক কাশ্মীরী হোটেলের ফুল বাগিচায় রাখা চেয়ারে বসলাম।

"ও পিসি, এ হোটেল যে একবারেই ফাঁকা!" শুভ্রা কথাটি বলে স্বপ্নার দিকে চাইল।

"হবেই তো, এখন যে অফ্ সীজ্ন, মে মাসে এখানে লোকে ভিড় করে।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, তবে 'স্কী', 'গলফ্' খেলবার জন্য এখানে ডিসেম্বরে সাহেব মেমদের দস্তুরমত ভিড় হয়।" আমাদের দেখে হোটেল কর্মচারী রেডিও খুলে দিয়েছে। একজন কাশ্মীরী এসে জিজ্ঞাসা করল, "মেমসাব চা কিংবা কফি চাই?"

তার কথা শুনে শুভ্রা চুপিচুপি বলল, "এরা খালি পয়সা কামাবার তালে আছে।" স্বপ্না কাশ্মীরীকে জানালো, "এইমাত্র আমারা কফি খেয়ে আসছি। অন্য কিছু দরকার নেই।"

অমু বলল, "ঐ তো ওঁরা সকলে ফিরে এলেন। কাকাবাবু উঠুন, ঐ দিকে যাওয়া যাক।" আমরা শিখ হোটেলে এসে দেখি ওরা সকলে চা খাচ্ছেন ও খিলানমার্গের গল্প বলছেন।

আমি রূপেনের পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, "দেখাও আজ কি লিখলে?" রূপেন ঝোলাটি স্বপ্নার হাতে দিল। শুভ্রা স্বপ্নার পাশে বসল। স্বপ্না খাতা খুলে হাসিমুখে পড়তে সুরু করল,

"গুলমার্গ কাশ্মীরের এক স্বপ্ন রাজ্য। তার চারিদিকে বেড়া দেওয়া অত্যুচ্চ তরঙ্গায়িত পর্বতমালা। পর্বত অঙ্গে গগনচুম্বি ঝাউ, শিষম ও

দেওদার বনানী। তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলিতে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে চোখ ঝলসে দিচ্ছে। কোন স্থানে তুষার গলিত রূপালি ধারা পর্বত অঙ্গ বেয়ে মর্তে অবতরণ ক'রে নির্ঝরিণীর সৃষ্টি করেছে। সবুজ তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূমিতে কয়েকটি হোটেল। হোটেলগুলিকে মধ্য-মণি করে প্রাকৃতিক মৌসুমী পুষ্পোদ্যান। তার সুমিষ্ট গন্ধ ও সৌন্দর্যে পর্যটক দল বিমুগ্ধ।

"পর্বতের সানুদেশে তাঁবু খাঁটিয়ে ছাত্ররা পিক্‌নিক্ অন্তে জাতীয় সঙ্গীতে মুখর। অপরদিকে কোলকাতার কুণ্ডু স্পেশালের যাত্রীদল খাবারের বাক্স হাতে হাস্যকৌতুকে মশগুল। অদূরে কিছু নীচে এক শীর্ণকায়া স্রোতস্বিনী কুলুধ্বনি সহ প্রবাহিত।

"হিমালয় উপরিস্থিত গৌরীপুষ্পোদ্যান মোগল অধিকৃত হয়ে ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইউসুফ কর্তৃক গুলমার্গ নামে অভিহিত হয়।

"সমগ্র অঞ্চলটি এক বর্গমাইল একটি সুন্দর রাস্তা দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুদূরে নাঙ্গা ও হারমুখো পর্বতশৃঙ্গের দৃশ্য রমণীয়। মাত্র তিন মাইল দূরে ১১৫০০ ফুট উচ্চে খিলানমার্গ। খিলানমার্গ থেকে উলার হ্রদ, শঙ্করাচারিয়া মন্দির, পীর পাঞ্জাল পর্বত শ্রেণীর দৃশ্য ঠিক ফ্রেমে আঁটা এক একখানি ছবি।

"ভারতের 'স্কী' ক্লাবের এখানেই প্রধান কার্যালয়। গুলমার্গে উচ্চশ্রেণীর দু'টি গলফ্ ক্লাব অবস্থিত।

"মে মাস থেকে এখানে পর্যটকদের ভিড় সুরু হয়। কিন্তু ডিসেম্বরের প্রথম থেকে মার্চ পর্যন্ত গুলমার্গের গাঢ় সবুজ মাঠ তুষারাবৃত হ'য়ে যায়। প্রথম গল্‌ফের ব্যাগ নিয়ে খেলোয়াড়দের দল নেমে আসে এইখানে। সমগ্র এশিয়ার গলফ্ খেলার এটি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান বলে প্রসিদ্ধ। শুভ্র তুষারাবৃত মাঠে 'স্কী' করব্যর জন্য সাহেব ও মেমেরা টাট্টু চড়ে খুশিতে উপচে পড়ে গুলমার্গ ও খিলানমার্গে সমবেত হন।"

পড়া শেষ হয়ে গেল। স্বপ্না সকলের উপর একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে খাতা বন্ধ করল।

মিঃ ঘোষ বললেন, "মিঃ মুখার্জীর পাকা হাত দেখছি। ইতিহাসের খুঁটিনাটি সব তথ্য দিয়ে সুন্দর বর্ণনা করেছেন। বই-টই কিছু লিখছেন না কি?"

শুভ্রা বলল, "কয়েকখানি বই বাজারে বেরিয়েছে। তা ছাড়া পিসেমশায় বড় শিল্পী। খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারেন।"

মিঃ দাস বললেন, "এই বইখানা ছাপা হলে আমরা যেন জানতে পারি।"

বৌদি বললেন, "শুধু জানতে পারলে হবে না। আমাদের নাম ধামগুলো সব পালটে দেবেন। যাতে আমরা ছাড়া আর কেউ বুঝতে না পারি।"

দু'ঘণ্টা গুলমার্গে কাটিয়ে আমরা ফেরবার সময় চার মাইল রাস্তা মাত্র এক ঘণ্টায় নেমে এলাম। এসে দেখি বৌদিরা আমাদের অনেক আগে পৌঁছে গেছেন।

এক সাহেব ও এক মেম ঘোড়ায় চড়ে গুলমার্গ যাচ্ছিলেন। আমাদের ফিরতে দেখে মেমটি ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, "গুলমার্গে কি খুব শীত দেখে এলেন?"

রূপেন হেসে জবাব দিলেন, "গুলমার্গে শীতের লেশ মাত্র নেই, তবে খিলানমার্গে সামান্য শীত আছে।"

শোনমার্গ

পরদিন আবার সকাল ন'টায় আমরা শোনমার্গ দেখতে বার হলাম। আজ গাইড হিসাবে দীননাথ পণ্ডিত ও দু'জন ভৃত্যকে চায়ের সরঞ্জাম সমেত ম্যানেজার সাহেব আমাদের বাসে উঠিয়ে দিলেন।

গাইডের উৎসাহে আমরা কিছুদূর এসেই এক জলবিদ্যুৎ কারখানায় ঢুকলাম। অবোধ্য যন্ত্রপাতি সকলে বিজ্ঞতার ভানে নিরীক্ষণ করাতে কর্মীদের মধ্যে বেশ কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিল।

পুনরায় বাসে চেপে আমরা দেড় ঘণ্টার মধ্যে গন্তব্যস্থানে পৌঁছলাম। শ্রীনগরের ৫১ মাইল দূরে ঠিক ঈশান কোণে শোনমার্গ অবস্থিত। উচ্চতা ৮৯৫০ ফুট। অর্দ্ধবর্গ মাইল এক অসমতল জায়গা।

বাস থেকে নামার সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশে আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেললাম।

চারিধারে তুষার ঢাকা পর্বত শৃঙ্গ। পাশে গভীর জঙ্গল। তারই নীচে শীর্ণকায়া এক চঞ্চল নদী মাটি ও পাথরের উপর দিয়ে সরোষে প্রবাহিত। ইতস্ততঃ প্রাকৃতিক উদ্যানে মৌসুমী ফুলগুলি এক দৃষ্টে চেয়ে পর্বত অঙ্গে মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখতে মত্ত।

পর্যটকদের জন্য ছোট্ট একটি বাংলো। তারই পাশে একফালি জায়গা জুড়ে সাদা দড়ি দিয়ে ঘেরা। সৈনিকদের তাঁবু। তাঁবুর সামনে একখানি জীপ। সেইখানে এক পাথরের উপর একাকী চুপচাপ বসে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর শুভ্রা দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "কাকাবাবু ওঁরা সকলে দীননাথবাবুর সঙ্গে স্নোফলস্ দেখতে চলে গেলেন, আপনি যাবেন না ?"

"কে কে গেলেন ?"

"মিঃ ঘোষ, মিঃ দাস, মিঃ দাঁ, পিসেমশায়, মৃণালবাবু ও আরও অনেকে।"

"তোমরা যাবে না ? স্বপ্না কি বলে ?"

"পিসিমাই তো আপনাকে ডাকতে পাঠালেন, বললেন আমরাও যাব—শুভ্রা দাদাকে শীগ্‌গীর ডেকে আন।"

শুভ্রার সঙ্গে বাসের কাছে এসে বৌদিকে লক্ষ্য করে বললাম, "চলুন কে কে স্নোফলস্ দেখতে যাবেন?"

বৌদি বললেন, "আমরা আর এখান থেকে উঠছি নে। আপনি বরং শুভ্রা, স্বপ্না ও আর যাঁরা যেতে চান তাঁদের নিয়ে ঘুরে আসুন।"

"দীননাথবাবু কতদূর গেলেন?"

স্বপ্না বলল, "যে রকম স্পীডে ওঁরা গেছেন তা এতক্ষণ মাইল খানেক পার হয়ে গেছেন নিশ্চয়।"

"বল কি? চল তবে শীগ্‌গীর, ওঁদের ধরতে হবে।"

মিসেস দাস বললেন, "তাড়াতাড়ি তাহলে বেরিয়ে পড়ুন।"

স্বপ্না, শুভ্রা, অমু, শশীবাবু ও আমি এই পাঁচজনায় হাঁটতে সুরু করলাম। রাস্তা সংক্ষেপ করবার জন্য তুষার শৃঙ্গ লক্ষ্য করে আমরা কোণাকুণি সোজা পথ ধরলাম। কিছুদূর এসে বনের মধ্যে ঢুকলে গভীর গর্জন শুনতে পেলাম।

শুভ্রা বললে, "নিশ্চয়ই নিকটে কোন নদী আছে।"

স্বপ্না বললে, "পার হতে হলেই তো হয়েছে। যে কনকনে ঠাণ্ডা!"

শশীবাবু বললেন, "রাস্তা সংক্ষেপ করেই হয়তো উল্টো ফল হল।"

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা এক ঝরণার কাছে এলাম। রাস্তা বন্ধ। ঝরণা থেকে একটি খরস্রোতা নদী বয়ে চলেছে এঁকে বেঁকে।

বাধ্য হয়ে আমরা কিছুদূর পিছিয়ে এসে অন্য পথ ধরলাম। বন শেষ হয়ে গেল। এবার আমরা পাহাড়ের গা বেয়ে খাড়াই রাস্তা ধরে চললাম, যতই উঠছি সকলেরই শ্বাস কষ্ট হচ্চে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে সকলেই কিন্তু উপরে উঠছেন মহা উৎসাহে। মনে হচ্ছে আর সামান্য দূর এগিয়ে গেলেই তুষার স্তুপগুলি হাত দিয়ে ধরা যাবে। কিন্তু এক সঙ্কীর্ণ স্থানে উঠে আমরা আটকে পড়লাম।

পিছন ফিরে দেখি সকলে বসে পড়েছেন। আমিও বসতে বাধ্য হলাম। অত্যাধিক বাতাসের চাপে আমরা দাঁড়াতে পারলাম

না। দেখি আমাদের পাশেই একটি বড় টিলার পিছনে এক শিখ দম্পতি বসে আখরোট খাচ্ছেন। পাশে দামী ক্যামেরা ও বায়নাকুলার।

শুভ্রা বলল, "বাব্বা, এখন মানে মানে নামতে পারলে বাঁচি। মেয়ে হয়ে জন্মানই এক বিড়ম্বনা, পদে পদে বাধা আর বিপত্তি।"

আমি বললাম, "শশীবাবু ও অমু তো পুরুষমানুষ, ওঁরা বসলেন কেন?"

"ধুতি তবু আঁটসাঁট করে পরা যায়, কিন্তু শাড়ীকে কায়দা করা শক্ত। পিসি তুমি কিছু বলছ না কেন?"

"বারে দাদা তো টাঙ্গামার্গে চাক্ষুষ দেখেছেন, ঘোড়ায় চড়বার সময় আমরা কি রকম ফ্যাসাদে পড়েছিলাম? দাদার যে প্যান্ট তাই, বাতাসের দাপট ঠিক বুঝতে পারলেন না।"

শুভ্রা বললে, "আমার কাকা তো প্যান্ট পরেন না। আর অমুর কথা ছেড়ে দিন। গুলমার্গ যেতে ভয়ে ও ঘোড়ায় চাপলো না।"

"কেন বৌদি তো চমৎকার ঘোড়ায় চড়ে গুলমার্গ দেখে এলেন?"

"মা তো বীরাঙ্গনা। ভাইটি কিন্তু ভীরুর অগ্রগণ্য। আমি বাবাকে সব লিখে দিয়েছি।"

কথাটি বলে শুভ্রা অমুর দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করল।

"বলে যা বলে যা আজে বাজে যা মুখে আসে। থামলি কেন? বাবাকে লিখে দিয়েছেন তো বয়েই গেছে।" অমু কথাগুলি বলে গম্ভীর হল।

নামতে নামতে অমুর কথা শুনে আমরা হাসতে লাগলাম।

নীচে নেমে এসে আমি বললাম, "পরিধেয়, খাদ্যাখাদ্য, আচার ব্যবহার সবই আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। গরমের দিনে দিল্লী-বাসীদের উঠানে রাত কাটান ছাড়া উপায় নেই। মেয়েদের শালোয়ার

ও পায়জামা সে জন্য অপরিহার্য। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক ভেবে চিন্তে সেই জন্য চুড়িদার পায়জামা ও পাঞ্জাবী পোষাক বেছে নিয়েছেন।"

শশীবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "এই জন্যই তো সকলে মিঃ চ্যাটার্জির বুদ্ধির তারিফ করেন।"

শুভ্রা বললে, "খাঁটি সত্যি। আমাদের শালোয়ার-পায়জামা পরা থাকলে বাতাসে কাবু করতে পারত না।"

স্বপ্না বলল, "দাদা তো আমাকে প্যাণ্ট পরে আসতে বলে-ছিলেন, কিন্তু এত লোকের সঙ্গে আসতে হবে জেনে আমি রাজি হলাম না।"

আমি বললাম, "আবার দিল্লীতে দেখ এই শালোয়ার-পাঞ্জাবী এক প্রস্থ মাত্র ছ'গজ কাপড়েই হয়ে যায়। কাবুলে কিন্তু একটি থান লেগে যাবে।"

শুভ্রা বলল, "বাব্বা, একেবারে একটি পুরো থান?"

স্বপ্না জবাব দিল, "হ্যাঁ, তবে ওরা জীবন ভোর ঐ একটি পোষাক পরেই কাটিয়ে দেয়। আবার মৃত্যুকালে সেটি প্রিয়তম পুত্রকে দান করে।"

অমু বলল, "মন্দ কি? কোন রকমে একবার একটা পোষাক তৈরি করে নিলে আর পয়সা খরচ হয় না।"

অমুর কথায় সকলেই হাসলেন।

আমরা দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছি আমাদের বাসের সামনে খুব জটলা হচ্ছে, ওঁরা সকলে ফিরে এসেছেন। মৃণালবাবু হাত নেড়ে কি যেন সকলকে বলছেন।

কাছে এসেই শুভ্রা মৃণালবাবুকে বলল, "দূর থেকেই আপনার হাত পা নাড়ার বহর দেখতে পেয়েছি। মনে হচ্ছিল আপনি সুন্দর-বনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার শিকার করে এনেছেন।"

মৃণালবাবু একটু ঘাবড়ে গিয়ে একটা তুষারের চাপ তুলে ধরে বললেন, "দেখুন না এও প্রায় সেই রকম।"

শুভ্রা বললে, "ছোঃ, ঐটুকু চাপ এনেই এত লাফঝাঁপ? পিসি বলত ওঁকে, আমরা কত বড় চাপ পেয়ে ছেড়ে দিয়েছি?" হতভম্ব হয়ে মৃণালবাবু একেবারে চুপ করে গেলেন। বৌদি তাঁকে সমর্থন জানিয়ে বললেন, "তা তোরা সেটা আনলি নে কেন বাপু।"

"মার যেমন কথা? তাহলে তো ছুটো মুটের দরকার হত।"

অমু বলল "মা, দিদি স্রেফ সবাইকে গুল ঝাড়ছে।"

আমরা হেসে ফেললাম।

স্বপ্না বললে "ঠাকুরপো কেমন জব্দ? তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার এই শাস্তি।"

সকলের সঙ্গে আমরাও খাবার খেলাম। শ্রীনগরে হোটেলে তৈরী করে ম্যানেজার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তবে চা আর আমাদের কারো ভাগ্যেই জুটল না। কেটলি থেকে গরম জল কাপে উঠিয়ে সবাই শেষ করে দিলেন। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য জল ঠিক গরম হল না। তাঁবুর সামনে কতকগুলি নূতন তিব্বতী উদ্বাস্তু চমরু বলদ সমেত এসে উপস্থিত হল। চীনাদের অত্যাচারে ওরা হাঁটা পথে তিব্বত থেকে এখানে পালিয়ে এসেছে।

বেলা চারটের সময় আমরা বাসে উঠে শ্রীনগরে ফিরে চললাম। সন্ধ্যার মধ্যে বাসটি সহরে পৌঁছে গেল। বাসটি মন্থর হয়ে কিছুদূর এসে রাস্তার উপর থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই কালো বোরখা পরা কতকগুলি কাশ্মীরী মহিলা হঠাৎ আমাদের বাসে উঠে পড়লেন। আমরা বিরক্ত হয়ে পিছনের সীটগুলি ছেড়ে সামনে এসে বসলাম। আমাদের কণ্ডাক্টার ড্রাইভার দু'জনাই হিন্দু। তাদের লক্ষ্য করে মিঃ ঘোষ বললেন, "আপনারা অত্যন্ত লোভী, আমাদের

রিজার্ভ বাস সত্ত্বেও কেন এতগুলি যাত্রীকে পয়সার লোভে ওঠালেন ?”

মিঃ দাস বললেন,“ম্যানেজারকে বলে ওঁদের টাকা কেটে নেওয়া যাবে।”

দীননাথ পণ্ডিত নম্রভাবে বললেন, “সাহেব, এঁরা মধ্যবর্তী শ্রেণীর ধর্মপ্রাণা মুসলমান। কাশ্মীরে হজরত মসজিদে আজ এঁদের বিশিষ্ট পার্বণ আছে, ওঁরা ভুল করে সাধারণ বাস ভেবে এ বাসে উঠে পড়েছেন।

“আমাদের কণ্ডাক্টার ওঁদের কাছে এক পয়সাও নেবে না, আপনারা ওঁদের ভুল বুঝবেন না।”

কিছুদূরে এক মেলার কাছে এসে সত্যই ওরা কিছু না দিয়ে নেমে পড়ল। আমরাও কিছুক্ষণের মধ্যে হোটেলে পৌঁছে গেলাম।

পাহল গাঁও

আবার পরদিন সকালে আমরা পাহল গাঁও-এর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। শ্রীনগর আসার সেই পরিচিত পথ ধরে সারিবন্দী চিনার ও পপলার গাছের মাঝখান দিয়ে ঝিলামকে দেখতে দেখতে পামপুর জাফরান খেতের পাশ দিয়ে বাস ছুটছে উল্কা বেগে। কতকগুলি ভাঙ্গা বাড়ি দেখিয়ে মিঃ ঘোষ প্রশ্ন করলেন, “মিঃ চ্যাটার্জি কি ওগুলো সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন ?”

“কোন ধ্বংসস্তূপ হবে বলে মনে হয় মিঃ ঘোষ।”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও ঠিক তাই ভেবেছি।”

পাশ থেকে দীননাথ পণ্ডিত বললেন, “ওগুলি অবন্তীপুর প্রাচীন

মন্দিরের ধ্বংসমুখী শিল্প সম্ভার। ভারতের হিন্দু সভ্যতার এক নিদর্শন।"

মিঃ ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন, "এগুলি কতদিনের ঘটনা? জানেন কিছু?"

"রাজা অবন্তীবর্মার সময় এ মন্দির নির্মিত হয়। ৮৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এখানে রাজত্ব করেছিলেন। এর বেশি কিছু জানি নে।"

বাস খানাবল থেকে উত্তর-পূব দিকে চার মাইল এসে 'অনন্তনাগ' পৌঁছুল। স্বপ্না বলল, "দাদা দীননাথবাবু আমাদের নামতে বলছেন।"

"কেন, এখানে আবার কি আছে?"

"আছে কিছু দেখবার, সকলেই তো নামছেন।"

রূপেন বলল, "ওঠ তবে, আমরাও দেখে আসি।"

সকলে নেমে এলে রাস্তার ধরে একটি উৎস দেখিয়ে দীননাথবাবু বললেন, "এটা গন্ধকের প্রস্রবণ, এখানে তিন-চার দিন স্নান করলে যে কোন রকমের দুরারোগ্য চর্মপীড়া আরোগ্য হয়ে যায়। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আপনারা জল খেলে বুঝতে পারবেন।"

আমরা জল খেলাম। জলে গন্ধকের গন্ধ পাওয়া গেল।

দীননাথবাবু বললেন, "অনন্ত চতুর্দশীতে এখানে এক বিরাট মেলা বসে। আশেপাশের বহুলোক চারদিক থেকে এসে উৎসবে যোগ দেয়। এখানকার কাঠের কাজ ও পুরাতন কম্বল থেকে তৈরী 'গাব্বা' আসন প্রসিদ্ধ।"

আমরা তাঁর কথা শুনতে শুনতে বাসে উঠলাম এবং কিছুদূর এসে পুনরায় নেমে পড়লাম। মিঃ দাস দীননাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে আবার কি আছে? জায়গাটার নামই বা কি?"

"জায়গাটির নাম বাওয়ান। এখানেও একটি উৎস আছে।"

আমরা দীননাথবাবুর সঙ্গে কিছুদূর এসে একটি প্রস্রবণ দেখতে পেলাম। দীননাথবাবু বললেন, "এইটিই বিখ্যাত মার্ত্তণ্ড প্রস্রবণ।"

মিঃ দাস বলেন, "ভারি সুন্দর দৃশ্য তো?"

মিঃ ঘোষ জবাব দিলেন, "সত্যই অপূর্ব।"

প্রস্রবণের চারিধার সুন্দরভাবে বাঁধান। জলের মাঝখানে সুন্দর একটি ছোট্ট মন্দির। মিঃ দাস, মিঃ দাঁ ও আরো অনেকে মন্দিরের ফটো নেবার জন্য ব্যস্ত হলেন। স্বপ্না ও শুভ্রা আমার হাত ধরে রেলিং-এর পাশে নিয়ে এল। তারপর আঁজলা ভরে জল খেতে সুরু করল। শেষ পর্যন্ত ওদের কথায় আমিও কয়েক আঁজলা জল খেলাম।

জলের সুন্দর স্বাদ। স্বচ্ছ নীল জলে অসংখ্য 'ট্রাউট্' মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ভেসে বেড়াচ্ছে। মিঃ ঘোষ এসে আমার পাশে বসে জল খেয়ে বললেন, "এখানকার লোকের কেবল জল ও হাওয়া খেলেই চলে যায়। আর কিছু খেতে হয় না। এতেই গায়ের রং ও স্বাস্থ্য।"

আমি বললাম, "তা যা বলেছেন মিঃ ঘোষ।"

দীননাথবাবু এসে মিঃ ঘোষকে বললেন, "মশায় এখান থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে গেলেই মার্তণ্ড মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ দেখতে পাবেন, আপনারা যাকে সূর্যমন্দির বলেন।"

মিঃ ঘোষ বললেন, "সূর্য মন্দির তো উড়িষ্যায় কোনারকে আমরা দেখে এসেছি। আর কোথাও আছে বলে তো শুনিনি? মন্দিরটি কতদিনকার কিছু জানেন?"

"রাজা ললিতাদিত্য ৬৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর সময়েই এই সুবৃহৎ মন্দিরটি নির্মিত হয়।"

মিঃ দাস বললেন, "তাহলে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন বলুন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ ধ্বংস হতে চলেছে। অপূর্ব কারুকার্য বিশিষ্ট শিল্প নিদর্শন।"

মিঃ ঘোষ বললেন, "আরো কিছুদিন মুসলিম রাজত্ব টিকলে হিন্দুর অস্তিত্বই হয়তো লুপ্ত হয়ে যেত, তার আবার মন্দির!"

মিঃ দাস বললেন, "তা যা বলেছেন। আমরা ইংরাজ রাজত্বে তো অমুসলমান বলে গণ্য হয়েছি—যেন মুসলমানদেরই ভারতবর্ষ। তারাই ভারতের আদিম জাতি।"

দীননাথবাবু বললেন, "আমরা তো বিশেষ ভুক্তভোগী। পাকিস্থানী হামলায় ভারত সাহায্য না করলে আজ কাশ্মীরের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যেত।"

আমরা আবার বাসে উঠে বারটার মধ্যে পাহল গাঁও পৌঁছে গেলাম।

দীননাথবাবু আমাদের 'ওয়াজীর হোটেলে' উঠালেন। শুনলাম এখানেই আমাদের আজকের আহারাদির ব্যবস্থা হয়েছে। ঠাকুর চাকর ও জিনিসপত্র সবই আমাদের সঙ্গে বাসে এসেছে।

হোটেলের সামনে সবুজ ঘাসের উপর সুন্দর রঙিন ছাতার নীচে গোল টেবিল ঘিরে আমরা দলে দলে বসে পড়লাম। ভৃত্যেরা ট্রে করে চা বিস্কুট আমাদের পরিবেশন করল। আমরা চা খেতে সুরু করলাম। চা খাওয়া শেষ হলে মিঃ দাস বললেন, "আপনারা একটু বসুন, ঠিক এই ভাবে, আমি কয়েকটা এক্সপোজার দিয়ে নিই।"

মৃণালবাবু তাড়াতাড়ি শুভ্রার টেবিল থেকে রঙিন 'ট্রে' সমেত 'টী' সেট উঠিয়ে আমাদের টেবিলে এনে রাখলেন। তার পর একটি খালি কাপ নিজের মুখের সামনে ধরে বসলেন।

শুভ্রা সঙ্গে সঙ্গে তার চেয়ার টেনে স্বপ্নার পাশে আমাদের টেবিলে এসে বসল। তারপর চাপা স্বরে বলল, "ইস্ আমাকে বাদ

দিয়ে আমারই 'টী' সেট এনে ফটো তোলা ?" তার কথায় আমরা হাসতে লাগলাম।

মিঃ দাসের ক্যামেরা এই সময় বার কয়েক 'ক্লীক্' 'ক্লীক্' আওয়াজ করে বন্ধ হয়ে গেল।

সকলেই হোটেলের আশে পাশে বেড়াতে লাগলেন। আমরা কয়েকজন হোটেল ছেড়ে রাস্তায় উঠে টাট্টু ভাড়া করে একটা চক্র দিয়ে হোটেলে ফিরলাম।

এসে দেখি এরই মধ্যে একদলের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। আমরা দ্বিতীয় দলে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তোফা গরম খিচুরি ভাজাভুজি দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে ভর পেট খেয়ে উঠলাম। মিঃ ঘোষ ও মিঃ দাসের এখনও পর্যন্ত খাওয়া হয় নি, তাঁরা 'চন্দনবাড়ি' যাবার জন্য দীননাথবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করছেন। আমি ঘরে এসে তাঁদের পাশে বসলাম।

হঠাৎ অমু এসে বলল, "কাকাবাবু ওঘরে মা আর পিসিমা আপনাকে ডাকছেন।"

"কেন বলত ?"

"কিছু মতলব আছে মনে হয়।"

এমন সময় শুভ্রা এসে বলল, "কাকাবাবু নীলগঙ্গার ধারে আমরা বেড়াতে যাব।"

"ন্নপেন কোথায় গেল ? তার সঙ্গে যাও না ?"

"তবেই হয়েছে। পিসেমশায় কোনরকমে নাকে মুখে গুঁজে কোথায় কেটে পড়েছেন।"

"বেশ ওঁদের ডেকে আন, আমি উঠছি।"

বেলা ছটোর সময় আমরা হোটেলের পিছনে নীলগঙ্গার ধারে বেড়াতে এলাম। স্বপ্না দূরে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওদিকে একবার চেয়ে দেখুন দাদা।"

আমরা সকলেই চেয়ে দেখি, অদূরে নদীর পারে বসে রূপেন একমনে লিখে চলেছে।

আমরা দিক পরিবর্তন করে ভিন্ন পথে নদীর ধারে এলাম।

বৌদি বললেন, "ঠাকুরপো নীলগঙ্গার জল এনে আমাদের মাথায় ছিটিয়ে দিন। আমাদের সঙ্গে আপনারও পুণ্য সঞ্চয় হবে।"

সুনীল জল ফেনিল উদ্দামে বয়ে চলেছে। আমি কন্‌কনে ঠাণ্ডা জল এনে সকলের মাথায় ছিটিয়ে দিলাম। বৌদি "গঙ্গা গঙ্গা" বললেন।

তারপর নদীর ধারে পাথরে বসে জলে হাত দিয়ে সকলে খেলা সুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে হাত অসাড় হয়ে এল। আমরা উঠে পড়লাম।

কাল ভোরে মিঃ ঘোষ ও মিঃ দাসের চন্দনবাড়ি যাবার জন্যে দীননাথবাবুকে রেখে আমরা চারটের সময়ে বাসে উঠলাম। বাস পাহল গাঁও ছেড়ে খানাবলের দিকে নেমে চলল।

বৌদি সামনে থেকে আমাকে বললেন, "ঠাকুরপো, আজ আপনার ভগ্নীপতি কি লিখেছেন পড়ে শোনাতে হবে কিন্তু।"

আমি রূপেনের ব্যাগ থেকে খাতাখানি বার করে শুভ্রার হাতে দিয়ে বললাম, "তুমি পড়, আমরা সকলে শুনি।"

শুভ্রা উৎসাহভরে খাতা খুলে পড়তে সুরু করল,

"শ্রীনগরের ৬০ মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে পাহল গাঁও ক্ষুদ্র শহর। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের লীলাভূমি ভূস্বর্গ কাশ্মীর। পাহল গাঁও তার প্রধানা হয়ে মধ্যমণির মত বসে আছে কাশ্মীর বক্ষে। বিধাতা ত্রিভুবনের সৌন্দর্য ভাণ্ডার থেকে তিল তিল পরিমাণে সৌন্দর্য আহরণ করে পাহল গাঁওকে তাঁর সুনিপুণ হস্তে নিখুঁতভাবে সজ্জিত করেছেন। তাই সমগ্র কাশ্মীরের প্রাকৃতিক লীলাভূমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত।

"দেবতাত্মা হিমালয় বক্ষে তরঙ্গায়িত তুষারমালাবৃত গিরিশৃঙ্গের

পাদদেশে চির, পাইন বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে উৎস, হ্রদ, নদী ও প্রাকৃতিক পুষ্পোদ্যান শোভিত নীলগঙ্গার চঞ্চলতা-মুখর মর্মর ধ্বনি নদীতটে অবস্থিত এই শহরটি যেন সুরের একটি মূর্চ্ছনা।

"স্বর্গের অপ্সরী-কিন্নরীদের যেন এটি প্রমোদ উদ্যান। ৭২০০ফুট উচ্চে তীব্র শীতের মধ্যে পাহল গাঁও অপূর্ব সুষমামণ্ডিত একটি স্বপ্ন রাজ্য।

"শহরে ঢেউ খেলান সুন্দর কংক্রিটের রাস্তা। পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ বিপণী। পোস্টাফিস, টুরিস্ট অফিস ও সুন্দর ছবির মত রেস্ট হাউস শহরটির অলঙ্কার। দোকানগুলি নানান দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ, হোটেলগুলি যাত্রীশূন্য।

"শ্রাবণী পূর্ণিমার কয়েকদিন পূর্বেই পাহল গাঁও জনসমাগমে পূর্ণ হয়ে যায়। তখন ভারতের সকল প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থী তীর্থ যাত্রীর দল এখানে এসে সমবেত হন। সে সময় এখানকার রাস্তা, নদীর ধার ও মাঠ সৈনিকদের ছাউনি, সাধু সন্ন্যাসীদের তাঁবু, ঘোড়ার দল, পুলিস ও কুলি প্রভৃতির ভিড়ে সরগরম হয়ে যায়। সময় বুঝে নীলগঙ্গাও দুকূল প্লাবিত করে দুর্বার হয়ে বিদ্যুতগতিতে প্রবাহিত হয়।

"এখান থেকে ২৮ মাইল দূরে ১৩০০০ হাজার ফুট উচ্চে দুর্গম স্থানে ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান 'অমরনাথ'। যাবার রাস্তা না থাকায় ঘোটকে বা পদব্রজে যেতে হয়। ৯৫০০ ফুট উচ্চে চন্দনবাড়ির দৃশ্য অপূর্ব সৌন্দর্যময়। এখান থেকে দূরত্ব মাত্র দশ মাইল। বায়ুযানের মধ্য দিয়ে যাবার সময় অক্সিজেনের অভাব অনুভূত হয়।

"শেষের পাঁচ মাইল রাস্তা অতীব দুর্গম। জমাট বাঁধা তুষার স্তূপের উপর দিয়ে যাত্রীদের যাবার সময় কষ্টের সীমা থাকে না।"

পড়া শেষ হয়ে গেল। শুভ্রা খাতাটি আমাকে ফেরত দিল। বৌদি এবং আরও অনেকে রূপেনের লেখার আন্তরিক সুখ্যাতি করলেন। হোটেলে ফিরতে আমাদের রাত্রি হয়ে গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পাহল গাঁও থেকে ফিরে আমরা একদিন বিশ্রাম নিলাম। তার পর দিন সকালে চা খাবার আগে স্বপ্না বলল, "দাদা আজ সকালে তো আমাদের কোন প্রোগ্রাম নেই, এই ফাঁকে 'শঙ্করাচারিয়া মহা-দেব'-কে দর্শন করে এলে কেমন হয়?"

"মন্দ কি? আজ আবার মহাসপ্তমী, মহাদেব দর্শনে পুণ্য অর্জন ভালই হবে। তবে যাবার আগে পরিচিত মহলে একবার জানান দিতে হবে যে।"

"তাহলে আমি ঠাকুরপোকে বলে আসি সকলকে জানাবার জন্যে, কেমন?"

"কিন্তু এখন তুমি মৃণালবাবুকে পাবে কোথায়?"

রূপেন বলল, "একটি সীট খালি হওয়ায় কাল যে মৃণালবাবু পার্ক হোটেলে উঠে এসেছেন।"

আমি বললাম, "সেই ভাল স্বপ্না, তবে তুমি মৃণালবাবুকে একবার বলে এস।"

একটু পরে স্বপ্না ফিরে এসে বলল, "দাদা আপনারা তৈরী হোন, সকলকে সঙ্গে করে ঠাকুরপো এখুনিই এসে পড়বেন।"

আমি বললাম, "যাও রূপেন তাড়াতাড়ি পোষাক পরে এসো, আমি ধুতি সার্ট পালটে নিই।"

কিছুক্ষণের মধ্যে মৃণালবাবু এসে হাজির হলেন। সঙ্গে শশীবাবু ও অমু। আমি মৃণালবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আর সব কোথায় ?"

মৃণালবাবু বললেন, "দাদার যেমন কথা, এ কি মার্কেট যাওয়া নাকি ? দুর্গাঠাকুর হলেও কথা ছিল। একালে বুড়ো শিবের উপর কারো তত দরদ নেই।"

স্বপ্না বলল, "ঠাকুরপো হেঁয়ালি রেখে সরলভাবে ব্যাপারটা খুলে বলুন, যাতে আমরা বুঝতে পারি।"

মৃণালবাবু ভঙ্গি করে বললেন, "ভদ্রলোকেরা বলেন—হাঁটুতে বাত ও হাই ব্লাড প্রেসার। আর মহিলারা বললেন হার্টের অসুখ ও ঘুরনি রোগ। সুতরাং পাহাড়ে ওঠা অসম্ভব।"

"আর আমাদের শুভ্রা ?" কথাটি বলে স্বপ্না আগ্রহ ভরে চাইল।

তিনি বললে, "উপর নীচে করা ডাক্তারের নিষেধ। তার উপর পত্রে উনি মাথার দিব্যি দিয়ে পাহাড়ে উঠতে মানা করে দিয়েছেন।"

মৃণালবাবুর কথা বলার ভঙ্গিমায় আমরা সকলে হেসে উঠলাম। আমি বললাম, "চলুন তবে বাবার কাছে গিয়ে ওঁদের অবস্থা নিবেদন করে আসি, যদি হোটেলে এসে তিনি তাঁর ভক্তদের দর্শন দেন।"

শশীবাবু হেসে বললেন, "সেই ভাল মিঃ চাটার্জি, আর দেরী করবেন না।"

রাস্তায় এসে স্বপ্না অমুকে বলল, "দিদিকে আনতে পারলে না ?"

"ছেড়ে দিন না দিদির কথা। মৃণালবাবুকে স্রেফ গুল ঝেড়েছে। আসল কথা গাড়ি ঘোড়া ছাড়া এক পাও হাঁটবে না।"

শঙ্করাচারিয়া পাহাড়টি আমাদের হোটেলের পিছনে হলেও মন্দিরে যাবার রাস্তা একটু ঘুর পথে। আমরা বুলভার রোড ধরে কিছুদুর এসে বাঁ দিকে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পাহাড়ে ওঠবার রাস্তা পেলাম।

স্বপ্না অমু ও মৃণালবাবুর সঙ্গে খাড়া রাস্তা ধরে পাহাড়ে উঠতে সুরু করল। আমি, রূপেন ও শশীবাবু ঘুর পথে পাক খেয়ে উপরে উঠছি। কিছুক্ষণ পর আমরা এসে ওঁদের সঙ্গে মিলিত হলাম। ওঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এবার আমরা সকলে একসঙ্গে কিছুটা রাস্তা খাড়াই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে সুরু করলাম।

আমাকে লক্ষ্য করে মৃণালবাবু বললেন, "দাদা এখন কেমন লাগছে?"

স্বপ্না বলল, "ঠাকুরপো থামুন তো, নিজেরা এতক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে দাদার কাছে বাহাদুরি হচ্ছে।"

শশীবাবু বললেন, "মৃণালবাবু, বহু সিঁড়ি ভেঙ্গে মিঃ চ্যাটার্জির পা শক্ত হ'য়ে গেছে। আপনি আমাকে বরং ও কথা বলতে পারেন।"

আমি বললাম, "তা যা বলেছেন শশীবাবু, এ তো আড়াইশো ফুটও হবে না। মাদ্রাজে 'পক্ষীতীর্থে' ও 'গোল্ডেন রকে' এবং পুষ্করে 'সাবিত্রী পাহাড়ে' ওঠার কাছে এ কিছু নয়। আর 'সীমাচলম' ও 'কুতুবে' আমি একাধিকবার উঠেছি।"

শশীবাবু বললেন, "মৃণালবাবু মিঃ চ্যাটার্জির কথা শুনলেন তো?"

মৃণালবাবু "হুঁ" বলে হাসলেন।

স্বপ্নাই সকলের আগে উপরে উঠল। তারপর মন্দিরের দিকে চেয়েই বলল, "ও মা, পিসিমা যে!"

আমরা উঠে এলাম। তাড়াতাড়ি শ্লীপার খুলে স্বপ্না মন্দির চত্বরে উঠে পিসিমাকে প্রণাম করে বলল, "পিসিমা কেমন আছেন?"

"এস মা এস, রাজরাণী হও। হাতের নোঁয়া অক্ষয় হোক। আর আমাদের বেঁচে থাকা মা—যম ভুলে আছে। তা মা বুড়ো পিসি না হয় একটা কথা বলেই ফেলছে, তাই বলে কি রাগ করতে আছে?"

আমি ও রূপেন পিসিমাকে প্রণাম করলাম, তিনি বললেন, "দীর্ঘ-জীবি হয়ে রাজা হও বাবারা, বুড়ো পিসির কথায় রাগ করতে নেই বাবা। মনের দুঃখে কখন কি বলি, কিছুই খেয়াল থাকে না।"

স্বপ্না বলল, "পিসিমা অলকাকে দেখতে পাচ্ছি নে যে, সে কোথায়?"

"আর বলো না মা তাদের পরিশ্রমের কথা। রোজ সকালে শিবতোষ ও অলকা আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে যায়। ম্লেচ্ছ জায়গা, এছাড়া তো আর যাবার জায়গা নেই। তারপর ওরা বহুদূর থেকে জল আনে, বাজার করে ও রান্নার সব জোগাড় করে দু'টিতে আবার এসে আমাকে নিয়ে যায়।"

স্বপ্না বলল, "শিবতোষ কে পিসিমা? চিনতে পারলাম না তো?"

"ভারি ভাল ছেলে মা, রূপে গুণে সমান। পরের ছেলে যে এমন হয় তা আগে জানতাম না। ট্রেনেই আলাপ। পিসিমা বলতে অজ্ঞান। সেই তো এই ম্লেচ্ছ দেশে থাকা ও খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিলে, তার কল্যাণেই বাবা শঙ্করাচারিয়া মহাদেব দর্শন হয়ে গেল। আমাদের তো মা জ্বালামুখী যাবার কথা, সে-ই জোর করে কাশ্মীরে নিয়ে এলো।"

"যাও মা তোমরা মন্দিরে মহাদেব দর্শন করে এসে, আমার এখনো পূজো শেষ হয় নি।" কথা শেষ করে তিনি পূজোয় বসলেন।

আমরা মন্দিরে ঢুকে শঙ্করাচারিয়া শিবলিঙ্গকে দর্শন করে ভক্তি-ভরে প্রণাম করলাম। পাত্রে কিছু কিছু প্রণামী দিয়ে আমরা মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করলাম। পুরোহিতের অনুরোধে রূপেন একটা মোটা খাতায় আমাদের নাম ও ঠিকানা লিখে দিল। আমরা পুরোহিতকে প্রণাম করে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে করতে বাহিরে এলাম। রূপেন পুরোহিতের সঙ্গে গল্প সুরু করল।

মন্দিরের গায় বড় বৈদ্যুতিক বাতিগুলি দেখিয়ে মৃণালবাবু বললেন,

"বৌদি, এই আলোর জন্যই সে রাত্রে প্রদর্শনী দেখে ফেরবার পথে আমরা সাহস হারাই নি।"

"হ্যাঁ, সে রাত্রে দাদার মুখ থেকেই প্রথম শঙ্করাচারিয়া মহাদেবের কথা জানতে পারি।"

শশীবাবু বললেন, "মিঃ চ্যাটার্জি এখান থেকে চেয়ে দেখুন শ্রীনগর সহরকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে।"

মৃণালবাবু বললেন, "দেখুন বৌদি সত্যই কি অপূর্ব।"

স্বপ্না বলল, "দাদা আমরা ওদিকে গিয়ে একটু বসছি। আপনারা আসুন।"

"রূপেন কোথায় গেল?"

"উনি নিশ্চয়ই এতক্ষণ কোথাও বসে লিখতে সুরু করেছেন।"

"চল তোমরা, আমরাও যাচ্ছি ঐদিকে।"

শশীবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমরা মন্দিরের পিছন দিকে এসে উঠলাম। আমাদের কিছুদূরে বসে স্বপ্না, অমু ও মৃণালবাবু গল্প করছেন।

আমাদের ও স্বপ্নার মাঝখান দিয়ে একটি সরু পথ দেখিয়ে অমু বলল, "কাকাবাবু দেখুন এ দিক দিয়েও মন্দিরে আসবার রাস্তা আছে।"

শশীবাবু বললেন, "এ আর একটি রাস্তা। পাহাড়ে ওঠবার রাস্তা চারদিক দিয়েই আছে।"

একটু পরে নীচে থেকে একটা হাসির শব্দ কানে এল। শশীবাবু বললেন, "মনে হয় কারা যেন উপরে আসছেন।"

পরক্ষণেই হাত ধরাধরি করে এক যুবক ও যুবতী উপরে উঠলেন। আমাদের দেখে যুবতীর মুখ হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। মনে হল যুবকও যেন একটু ঘাবড়ে গেলেন। এখন মনে পড়েছে এঁদের আমরা কুঁদে দেখেছি। এই যুবকই পিসিমাকে হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন।

স্বপ্না যুবতীকে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছ অলকা ?"

একটু সামলে তিনি বললেন, "ভাল আছি দিদি।"

তারপর স্বপ্না ও আমাকে প্রণাম করে হাসি মুখে স্বপ্নার দিকে চেয়ে বললেন, "আজ কি সুদিন ? হঠাৎ দিদি ও দাদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।"

স্বপ্না হেসে বলল, "সেটা উভয়তই ভাই। আমরা মহাদেব দর্শনে এসেছিলাম বলেই দেখা হল। অনেকক্ষণ এসেছি এবার ফিরবো।" স্বপ্না উঠে দাঁড়াল।

"সে কি, এত তাড়াতাড়ি ?"

"হ্যাঁ ভাই, সকালে চা না খেয়েই সবাই বেরিয়েছি ? পার তো পার্ক হোটেলে একদিন বেড়াতে এসো না। আমরা সেখানে থাকি।"

অলকা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। আমরা সকলে এসে আবার মহাদেবকে প্রণাম করলাম। রূপেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। মহাদেবকে প্রণাম করে আমাদের সঙ্গ নিল।

ফেরবার সময় অন্য পথ ধরে খুব অল্প সময়ে আমরা নেমে পড়লাম। এ দিকটা কিন্তু চারিধারে কবর। একদল ছেলে ও মেয়ে ছুটে এসে আমাদের ঘিরে পয়সা চাইল।

আমরা দু'টি করে পয়সা দিলে তারা খুশী হয়ে বার বার সেলাম দিল। অমু বলল, "দু এক পয়সা পেলেই এদের মুখের হাসি ফোটে ও সেলাম দেয় বার বার।"

স্বপ্না বলল, "খুব গরীব বলে অল্পেতে খুশী হয়।" কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা হোটেলে ফিরে চা খেতে সুরু করলাম।

দুপুরে খাওয়া সেরে বৌদি ও শুভ্রা আমাদের ঘরে এলেন। স্বপ্না শুভ্রার দিকে চেয়ে বলল, "সকালে আমাদের সঙ্গে গেলে না কেন মা মনি ?"

বৌদি বললেন, "আমিই ওকে যেতে দিই নি ভাই। বিকেলে আজ একটি বড় প্রোগ্রাম আছে। একদিনে বেশি পরিশ্রম না করাই ভাল।"

শুভ্রা বলল, "আমাদের যাতায়াতের পথে সব সময়ই তো শঙ্করাচারিয়া মন্দির দেখছি। উপরের দৃশ্যটা পিসেমশায়ের খাতা দেখে পড়ে নেব।"

রূপেন হাত বাড়িয়ে খাতাখানি শুভ্রাকে দিল। বৌদি আগ্রহের সঙ্গে বললেন, "এখানেই বসে পড়—সকলে মিলে শুনি।"

শুভ্রা সুরু করল, "শ্রীনগরের মধ্যস্থলে প্রায় আড়াইশো ফুট উচ্চ একটি পাহাড়। তারই চূড়ায় শান্ত নিরালা পরিবেশে ধ্যানগম্ভীর শঙ্করাচারিয়া মন্দিরটি যেন একটি শান্তির রাজ্য।

"মন্দির অঙ্গে সুবৃহৎ বৈদ্যুতিক আলোকগুলি রাত্রে বহুদূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়ে পর্যটকদের মনে এক কৌতূহলের উদ্রেক করে। দিনে মন্দির থেকে কাশ্মীরের দৃশ্য অপূর্ব। একদিকে বিতস্তার বিসর্পিল গতি, ডাল বক্ষে হাউসবোট ও শিকারার চঞ্চলতা, অপর দিকে ধ্যানমগ্ন হরিপর্বত, পশ্চাতে গগনচুম্বি তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গগুলির হিরণ কিরণ স্পর্শে অপরূপ শোভাময়। এ দৃশ্য বিস্মৃত হওয়া যায় না। মনে ভাবাবেগের উদয় হয়।

"মহাসপ্তমীর প্রভাত মনের মণিকোটায় মহামূল্য মণিকার মত উজ্জ্বল হয়ে থাকে। মহাদেবকে পূজা করে নামতে থাকি চিত্তভরা আবেগে।

"একঠো পয়সা দিজিয়ে সাব'—তন্ময়তা কেটে যায় সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে। নিমেষে হারিয়ে ফেলি স্বর্গীয় সুষমা। স্বপ্নসৌধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় পার্থিব রূঢ় বাস্তাব আঘাতে। দেখি একদল নগ্ন দুঃস্থ বালক-বালিকার দ্বারা আমাদের পথ রুদ্ধ হয়েছে।

"প্রত্যেককে দু'টি করে পয়সা দিই। খুশীতে উপচে পড়ে তাদের চোখ-মুখ। রাস্তা ছেড়ে দাঁড়িয়ে বারবার সেলাম দেয়।

"পর্বতের পাদমূলে দেখা যায় বিভিন্ন রকমের অসংখ্য কবর। মনে পড়ে অভাগাদের করুণ ব্যাকুল কাকুতি। জবরদস্তি ধর্মত্যাগে বাধ্য না করবার শত অনুরোধ।"

"নিষ্ফল হয় নি তাদের ব্যাকুল প্রার্থনা, তাই মরণের পরপারে আদি দেবতা মহেশ্বরের পাদমূলে পেয়েছে সান্নিধ্য। পরিতৃপ্তিতে সকলে ঘুমিয়ে আছে শান্তির আনন্দে।

"শঙ্করাচারিয়ার বয়স নির্ণয় করা শক্ত। খৃষ্টপূর্ব ২৬২৯ থেকে ২৬৬৪ মধ্যে কাশ্মীরী হিন্দুরাজা কর্তৃক তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। খৃষ্টপুর্ব ৪২৬ থেকে ৩৬৫ মধ্যে রাজা গোপাদিত্য মন্দিরটি সংস্কার করেন। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য স্থানীয় লোকেদের বৌদ্ধধর্ম থেকে পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার পর থেকে মন্দিরটি শঙ্করাচারিয়া নামে অভিহিত হয়।

"কাশ্মীরের মহারাজা প্রতাপচন্দ্র এই মহাদেবের পরম ভক্ত ও সেবায়েত ছিলেন। বর্তমানে রাজাই দেবতার সেবায়েত। এখনও হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানদের নিকট মন্দিরটি প্রায় সমান প্রিয়।

"স্থানীয় হিন্দু মুসলমানদের বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন আদর্শ স্থানীয়। স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাঁরা ধর্মের জীগির তুলে সরল, শান্ত ও নিষ্পাপ হৃদয়ে জ্বেলে দেন হুতাসন—তাদের জন্য নাই কি বজ্র তোমার, হে ভগবান? তোমার কঠিন হস্তে খণ্ড ভারতের হীন সাম্প্রদায়িকতা হয় না কি অবসান?"

শুভ্রার পড়া শেষ হয়ে গেল। বৌদি রূপেনের খুব প্রশংসা করে বললেন, "খুব সুন্দর লেখা হয়েছে। আজকের লেখাটি আমার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে।"

তারপর একটু থেমে দুঃখ করে বললেন, "ভাগ্যে না থাকলে কিছু হয় না ভাই। তা নইলে শ্রীনগর এসে বাবা শঙ্করাচারিয়াকে দর্শন করতে যেতে পারলাম না।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নে মোগল উদ্যানগুলি দেখতে যাবার জন্য আমরা বাসে নাম। মিঃ ঘোষ ও মিঃ দাস চন্দনবাড়ি থেকে ফিরে আমাদের বাসে চাপলেন। বুলভার রোড ধরে বাস হোটেলের ডানদিকে এগিয়ে চলল। মিনিট দু'এর মধ্যে বাঁয়ে ডাল বক্ষে নেহেরু পার্ক ছেড়ে ডাইনে প্রতাপ পার্ক, রাজভবন, বিধানসভা ভবন অতিক্রম করলাম।

শুভ্রা বলল, "কাকাবাবু দেখুন, এদিকে কি সুন্দর হোটেল রয়েছে?"

স্বপ্না বলল, "ও বি, রায় প্যালেস হোটেল যে, সুদৃশ্য তো হবেই। এ যে এখানে বোম্বাই-এর 'তাজ' বা দিল্লীর 'অশোকা' হোটেলের মতই আভিজাত্যপূর্ণ।"

প্রথমে 'চশমাসাহী' তারপর 'নিশাতবাগ' দেখে আমরা 'শালিমারবাগে' উপস্থিত হলাম। প্রত্যেকে বাগানে ঢুকেই আমরা নিজেদের খুশীমত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছি। কখনও একক, কখনও বা একসঙ্গে তিনজনা। অমু আর আমি একসঙ্গে আছি। স্বপ্না, শুভ্রা ও বৌদি আমাদের সামনে চলেছেন।

অমু বলল, "পিসেমশায় আজ একেবারে দল ছেড়ে কেটে পড়েছেন।"

আমি বললাম, "কলম তাহলে জোর চলছে বল।"

"সে কথা আর বলতে।"

হঠাৎ শুভ্রার গলা শোনা গেল, "পিসি, দেখ দেখ মৃণালবাবুর কাণ্ডখানা ?"

তার কথা শুনে আমরা চেয়ে দেখি বাগানের মাঝখানে এক সুদৃশ্য সৌধের উপর থেকে মৃণালবাবু আমাদের দেখছেন।

শুভ্রা হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বলল, "ওখান থেকে দেখছেন কি ? শীগ্‌গীর নেমে আসুন। আমরা সকলে চলে যাচ্ছি যে।"

মুখ বিকৃত করে মৃণালবাবু বললেন, "পা যেন কে টেনে ধরেছে, ছাড়ছে না।"

শুভ্রা চেঁচিয়ে বলল, "ঠাট্টা নয়—কিছু বলা যায় না, বহু বেগমের অতৃপ্ত আত্মা এখনও ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

কথাটি শুনেই কিন্তু মৃণালবাবু নেমে এলেন।

শুভ্রা হাততালি দিয়ে হাসিতে লুটিয়ে পড়ে বলল, "মাগো কি ভীতু মানুষ। কেবল চেহারাই সার।"

বৌদি হেসে বললেন, "ভয় তো মনের, চেহারার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ আছে ?"

এমন সময় দু'জন যুবক আমাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজন অন্যকে প্রশ্ন করল, "শালিমার বাগ মানে কি ভাই ?"

অপরে উত্তর দিল, "আরে তা বুঝি জানিস নে, এর মানে হচ্ছে প্রেমকুঞ্জ। অর্থাৎ এখানে এলে প্রেম করতে হয়।"

শুভ্রা আরক্ত মুখে আমার দিকে ফিরে বলল, "কথাটা শুনলেন তো কাকাবাবু ? ইচ্ছে হয় ঠাস ঠাস করে চড় কষিয়ে দিই।"

বৌদি বললেন, "তুই রাগছিস্ কেন বাপু ? প্রত্যক্ষভাবে কাউকে কিছু না বলা পর্যন্ত এ সব কথা গায়ে মাখতে নেই।"

স্বপ্না বলল, "যত সব ডেঁপো ছেলে,ওদের কথায় কান দিও না।"

আমি বললাম, "শুভ্রা, বৌদির সঙ্গে এখানে আমরা একমত।"

আমরা বাসে উঠে সন্ধ্যার পূর্বে হাড়ওয়ান পৌঁছে গেলাম। এখানে এ উদ্যানটির পিছন দিকে মহাদেব পর্বত শীর্ষে মনোরম একটি হ্রদ আছে। এখান থেকেই শ্রীনগরে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। জলপ্রপাত থেকে জল পড়ে পর্বত অঙ্গে একটি হ্রদে সঞ্চিত হচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে সকলে বাঁধের উপর উঠে গেলেন।

বাগিচার আশপাশে একটু ঘুরে উপরে এসে দেখি আমি একা—দলছাড়া হয়ে পড়েছি। বাঁধের উপরে বহু লোক লকগেট দিয়ে জলছাড়া দেখছেন।

নিকটে একটি শিশু আর দু'জন কাশ্মীরী মহিলা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দেখতে লাগলাম।

দেখি শিশুটি চুপিসারে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার সঙ্গে তার চোখাচোখি হতেই সে দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। বার কয়েক এরকম করার পর আমি সাহস করে গিয়ে শিশুটির একটি হাত ধরলাম। সে তার মার আঁচলে মুখ লুকাল। সঙ্গে সঙ্গে এক কাশ্মীরী ভদ্রলোক আমার কাছে এসে হাসিমুখে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার ছেলে বোধ হয় আপনার কাছে দুরন্তপনা করেছে?"

আমি বললাম, "না মশায়, আমি আপনার শিশুকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। ঠিক যেন দেবশিশু। আমরা আগন্তুক—কলকাতা থেকে এসেছি। এত সুন্দর শিশু এর আগে আমি আর কোথাও দেখিনি।"

ভদ্রলোক কাশ্মীরী ভাষায় ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে কয়েকটি কথা বলে আমাকে মৃদু হেসে বললেন, "আসুন না আমাদের বাড়িতে একদিন। বদ্রীনাথ পণ্ডিত, ব্রীজ রোড বললেই যে কোন রাস্তার লোক আমার বাড়ি দেখিয়ে দেবে।"

ভদ্রমহিলাদের মাথায় কাপড়। তাঁরা মৃদু হাসির সাথে ঘাড় নেড়ে ভদ্রলোকের কথা বলার সময় তাঁকে সমর্থন করলেন।

আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাঁদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্প করলাম। তারপর শিশুকে আর একবার আদর করে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

বাঁধের উপর কিছুদূর এগিয়ে যেতেই মিঃ ঘোষের সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, "মিঃ চ্যাটার্জি কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? আপনাকে ধরবো বলে বাস থেকে নেমেই সোজা উপরে উঠে এগিয়ে চললাম। শেষ পর্যন্ত আপনার নাগাল পেলাম না—লাভের মধ্যে আমি দলছাড়া হয়ে গেলাম।"

আমি বলি, "আমারও আপনার মত অবস্থা। আমি সব শেষে উপরে উঠেছি। আপনাদের কাউকে দেখতে না পেয়ে আমি এক স্থানীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছিলাম। তবে মিঃ ঘোষ কাশ্মীরে আসা আজ এতদিন পরে সার্থক হল।"

"একটু খুলে বলুন স্যার, যাতে বুঝতে পারি। হঠাৎ এমন কি ঘটলো যার জন্য আপনি একথা বলছেন?"

আমি মিঃ ঘোষকে বদ্রীনাথ পণ্ডিতজীর শিশু ও আত্মীয়াদের সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনাটি বললাম। তাঁদের বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণের কথাও আনন্দের সঙ্গে প্রকাশ করলাম।

মিঃ ঘোষ বললেন, "তাড়াহুড়ো করে চন্দনবাড়ি থেকে আমাদের ফিরে আসাই সার হল মিঃ চ্যাটার্জি। এক যাত্রায় এ রকম পৃথক ফল সইব কেমন করে।"

"আপনাকে আর আক্ষেপ করতে হবে না। এখনও তাঁরা সেখানে আছেন, চলুন তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

'সেই ভাল"—বলে মিঃ ঘোষ আমার সঙ্গে চললেন, কিন্তু আমরা পূর্বস্থানে এসে দেখি বদ্রীবাবু চলে গেছেন।

এদিকে রাত হয়ে এসেছে, আকাশে তারা দেখা দিয়েছে। আমার হতাশ হ'য়ে হোটেলে ফেরবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামতে সুরু করলাম।

মিঃ ঘোষ বললেন,"অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়।"

কিন্তু কিছুদূর নামতেই সিঁড়িতে বদ্রীবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার বিশেষ বন্ধু বলে মিঃ ঘোষকে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। খুশী হ'য়ে বদ্রীবাবু বললেন, "মিঃ ঘোষ দয়া করে আপনিও আপনার বন্ধুর সঙ্গে একদিন আমার বাড়িতে আসুন না? যখন আমাদের আলাপ পরিচয় হল বাড়িতে বসে চা খেতে খেতে একটু গল্প করা যাবে'খন।"

মিঃ ঘোষ আগ্রহভরে বললেন,"নিশ্চয়ই যাব পণ্ডিতজী—এ আর বেশী কথা কি। আর আমরা তো আপনাদের দেশে বেড়াতেই এসেছি"

নমস্কার বিনিময়ের পর আমরা পণ্ডিতজীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। নীচে নেমে দেখি সকলে বাসে বসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমরা বাসে উঠতেই বাস ছেড়ে দিল।

স্বপ্না প্রশ্ন করল, "দাদা কোথায় ছিলেন আপনারা, আমরা এদিকে ভেবে মরছি?"

মিঃ ঘোষ উৎসাহিত হয়ে রসিয়ে রসিয়ে বদ্রীবাবুর ছেলে ও তাঁর আত্মীয়াদের প্রসঙ্গ তুলে গল্প করলেন। তারপর বললেন, "এতদিন পরে আজ খাঁটি কাশ্মীরী মহিলাদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হল।"

"মহিলাদের যেমন কাঁচা হলুদের মত গায়ের রং, তেমনি মৃণাল সদৃশ ভুজঙ্গ। সুষমা মাখান মুখশ্রী, জ্যোতির্ময়রূপী অপূর্ব রূপ। যেন জীবন্ত প্রতিমা আমাদের দিকে চেয়ে মৃদু হাসির সঙ্গে আমন্ত্রণ জানালো।"

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "মিঃ চ্যাটার্জি, এঁদের সঙ্গে পরিচয় হওয়া বা এঁদের সান্নিধ্যে আসা ভাগ্যের কথা। আজ ওদের সঙ্গে পরিচয় না হলে কাশ্মীরে হয়তো আসা বৃথাই হত।"

স্বপ্না একমুখ হাসি নিয়ে বলল, "আমরা এদিকে ভেবে সারা, আর আপনারা কাশ্মীরী বান্ধবী জুটিয়ে গল্পে মশগুল হয়েছেন তা জানব কেমন করে?"

মিঃ ঘোষ বললেন, "কাশ্মীরী বান্ধবী নয় স্বপ্নাদেবী, কাশ্মীরী বান্ধব বলুন।"

"ঐ একই কথা মিঃ ঘোষ, যার নাম চাল ভাজা তারই নাম মুড়ি।" কথা শেষ করার সঙ্গেই স্বপ্না হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল।

বাসের সকলের স্বপ্নার সঙ্গে হাসিতে যোগ দেওয়ায় চারিদিকে 'হা-হা' 'হি-হি' শব্দ সুরু হল।

রাতের খাওয়া শেষ করে শুভ্রা আমাদের ঘরে এসে স্বপ্নাকে বলল, "পিসি, মা আজকের লেখাটি দেখতে চাইলেন।"

স্বপ্না খাতাখানি শুভ্রার হাতে দিল। আমি বললাম, "আমাদের যে এখনও পড়া হয়নি শুভ্রা, তুমি বরং আমাদের শুনিয়ে খাতাখানি বৌদির জন্য নিয়ে যাও।"

শুভ্রা সুরু করল, "বাসে চেপে রাস্তার এক পাশে তরঙ্গায়িত পর্বতমালার মনোরম শৃঙ্গগুলি ও অপর পার্শ্বে ডাল বক্ষে উর্মিমালা বেষ্টিত যাত্রীবাহী শিকারাগুলির দুরন্তপনা দেখতে দেখছে দু' মাইল দূর 'চশমাসাহী' মোগল উদ্যানে পৌঁছে গেলাম।

"কতকগুলি ফোয়ারা ও পুষ্পলতা শোভিত এই উদ্যানটি সম্রাট সাজাহান কর্তৃক নির্মিত হয়। উদ্যানটি পর পর তিনটি স্তরে উপর দিকে উঠে পর্বত অঙ্গে মিলিত হয়েছে। কেন্দ্রস্থলে সুরম্য একটি বিলাস কক্ষ। ঠিক তার নিম্নে সঙ্কীর্ণ একটি রাস্তা স্তরে স্তরে নিম্নাভিমুখী গিয়ে প্রবেশ দ্বার পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। রাস্তার

উভয় পার্শ্বে জলাধার ও ফোয়ারাগুলি প্রাকৃতিক প্রস্রবণের জলে পরিপূর্ণ।

"চশমাশাহী থেকে তু'মাইল দূরে রমণীয় 'নিশাতবাগ' উদ্যানটি ৫৯৫ গজ দীর্ঘ ও ৩৬৯ গজ প্রস্থ। মোগল উদ্যানগুলির মধ্যে এটি সৌন্দর্যে ও আয়তনে শ্রেষ্ঠতম। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভ্রাতা আসফআলি কর্তৃক ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়। কথিত আছে সম্রাট জাহাঙ্গীর এই উদ্যানটি প্রথম দর্শনে মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান। তাঁর রচিত 'শালিমার বাগ' অপেক্ষা এটি গঠন ভঙ্গিমায় ও সৌন্দর্যে অপরূপ।

"পর পর দশটি চত্বর উর্দ্ধে উঠে পীর পাঞ্জাল পর্বত অঙ্গে মিলিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে অবস্থিত সুদৃশ্য বিলাস কক্ষ।

"বেগম মহলটি শিল্প সম্ভারে পূর্ণ। বেগমরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে এসে সৌন্দর্যময়ী ডাল হ্রদের দৃশ্যাবলী অবলোকন করতেন। বেগম মহল থেকে উদ্যানটির সৌন্দর্যও অপরূপ।

"উদ্যানটির মধ্যস্থল দিয়ে একটি স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয়ে প্রতি স্তরে একটি করে জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে নিম্নে প্রবেশদ্বার পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। ফোয়ারাগুলি থেকে সহস্র জলধারা সৃষ্টি হয়ে প্রস্ফুটিত ফুলঝুরির মত ঝরে পড়ছে নিয়ত। উদ্যানটির প্রতি স্তরে নবঘন দূর্বাদল কাশ্মীরী গালিচাকে ম্লান করে রেখেছে।

"মনে পড়ে মহীশূরের 'নববৃন্দাবন গার্ডেনে'র কথা। রাত্রে শত শত রঙিন ফোয়ারায় আলোকিত রোশনাই-এর ছটা। বাঙ্গালোরে 'লালবাগ' ও উদয়পুরের ফোয়ারার উদ্যান সহেলিওঁ কি বাড়ী মনে জাগে। একই সঙ্গে দেখেছি সহস্র রামধনুর জ্যোতির্ময় দ্যুতির অপূর্ব বর্ণসম্ভার। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময়ী গরীয়ান নিশাতবাগ সকলকে পরাস্ত করেছে তার অপরূপ গঠন ভঙ্গিমায়।

"শ্রেণীবদ্ধ অভ্রভেদী চিনার বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়া, আখরোট আর

আপেলের মিষ্টি চাহনি, মন মাতান অজস্র গোলাপ ও মৌসুমী পুষ্পগুচ্ছ প্রতি স্তরে স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত থেকে অপরূপ হয়ে উঠেছে। মন অজ্ঞাতে তাকে ভালবেসে প্রেমে পড়তে চায়। তাই বিদায় কালে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ব্যাথায় টন্ টন্ করে মোচড় দিতে থাকে। একে ভোলবার জন্য দেড় মাইল দূরে 'শালিমার বাগ' দেখতে রওনা হই।

"পত্নীপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রিয়তমা বেগম নূরজাহানের চিত্ত বিনোদনের জন্য এই স্বপ্নভরা মায়ার উদ্যান 'শালিমার বাগ' বা 'প্রেমকুঞ্জ' নির্মাণ করান। বিশ্ব-বিখ্যাত পরিব্যাপ্ত এই মনোহর উদ্যানটি তাঁর শ্রেষ্ঠতম কীর্তির অন্যতম নিদর্শন।

"কত যুগ গত হয়েছে, কত জাতির উত্থান-পতন হয়েছে, মোগল সাম্রাজ্য সমূলে উৎপাটিত হয়ে গেছে, কিন্তু পত্নী প্রেমের গৌরবময় নিদর্শন আজও পৃথিবী বক্ষে দীপ শিখার মত প্রজ্বলিত রয়েছে। অতীত সৌন্দর্য কালপ্রবাহে কিছুটা ম্লান হয়ে গেলেও অবশিষ্টাংশ দর্শনে মন মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়।

"উদ্যানটি দৈর্ঘ্যে ৫৯০ গজ, চারিটি চত্বর স্তরে স্তরে উপরে উঠে পর্বত গাত্রে মিলিত হয়েছে। রাশি রাশি প্রস্ফুটিত পুষ্প প্রতি স্তরে সৌন্দর্য বিস্তার করে দর্শকের মন সৌরভে ও সুষমায় ভরিয়ে দেয়। সর্বশেষ স্তরে বিলাস ভবনটি শিল্প সম্ভারে ঐশ্বর্যময়ী। কষ্টি-প্রস্তরে নির্মিত স্তম্ভগুলি সুরুচি ও শিল্পীমনের পরিচয় বহন করে।

"ভবনটির চারিদিক সুন্দর জলাশয় ও ফোয়ারা দ্বারা শোভিত। উদ্যানের প্রতি স্তরে যেন ঘন সবুজ ঘাসের কার্পেট বিছানো আপেল, আঙ্গুল, ন্যাসপাতি, ডালিম প্রভৃতি বিভিন্ন বৃক্ষদ্বারা সজ্জিত। বৃক্ষে পক্ষীর কূজন ও মধুমক্ষিকার গুঞ্জরণে গুঞ্জরিত।"

"জলপ্রপাত, প্রস্রবণ, উৎস ও ১৫০টি ফোয়ারা বিশিষ্ট এ রমণীয় উদ্যান অন্যস্থানে নির্মাণ করা সম্ভবপর নয়।

"নিশাত বাগ আকৃতিতে বৃহৎ হলেও শালিমার বাগের বহু পরে সৃষ্ট হয়েছে। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে শালিমার বাগ তার স্বীয় বৈশিষ্ট্যে গরীয়ান। কোন পার্থিব বস্তুর সহিত তার তুলনা করা সঙ্গত নয়।

"যুগ যুগ ধরে কত প্রেমিক ও প্রেমিকার দল এখানে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবস্থান করে গভীর আনন্দে স্বর্গ সুধা পান করেন, বিলাস কক্ষের মধ্যে গেলে তাঁদের মন উদাস করে দেয়। মনে তাঁদের প্রশ্ন জাগে—সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর মধ্যে কে কাকে বেশি ভালবাসতেন!"

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বাথরুম থেকে ডাকের পর ডাক শুনতে পাচ্ছি। জুতো পরে প্যাণ্ট হাতে নিতেই ম্যানেজার সাহেব দরজায় টোকা দিয়ে বললেন, "মিঃ চ্যাটার্জি, আপনার জন্য বাস অপেক্ষা করছে।" কোট হাতে নিয়ে ঘরের বার হয়ে দৌড় দিলাম।

বুলভার রোড়ে পর পর তিনখানি বাস ভর্তি যাত্রী। আমাকে দেখে মিঃ ঘোষের কন্যা ঝর্ণা বলল, "কাকাবাবু এ বাসে আসুন, বাবা আপনার জন্য জায়গা রেখেছেন।"

লাফ দিয়ে শেষ বাসে উঠতেই গর্জন করে বাসগুলি ছেড়ে দিল। আমি মিঃ ঘোষের পাশে বসে পড়লাম।

মিঃ দাস বললেন, "আজ যে দেখি নিয়মের ব্যতিক্রম। মিঃ চ্যাটার্জির রুটিনে দেরী বলে তো কিছু নেই জানতাম।"

মিঃ ঘোষ জবাব দিলেন, "আজো ব্যতিক্রম হয় নি, যথা সময়ে এসে গেছেন।"

আমি বললাম, "কি করব বলুন স্যার, ট্যাপে গরম জল ছিল না —তাই আসতে একটু দেরী হয়ে গেলো।"

শুভ্রা বলল, "আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ, কোন রকমে কাজ সেরেছি।"

মিঃ ঘোষ বললেন, "জলের আর অপরাধ কি। কাল সন্ধ্যার

মধ্যে হোটেলে 'ন স্থানম্ তিল ধারণম্' গোছের অবস্থা। শেষ পর্যন্ত ম্যানেজার সাহেব তাঁর নিজস্ব ঘরটিও এক পরিচিত সাহেব মেমকে ছেড়ে দিয়েছেন।"

ঝর্ণা বলল, "কাশ্মীরে তো দেখি বাঙ্গালীর ভিড়। দু' দশজন সাহেব মেম ছাড়া কদাচিৎ দু' একজন পাঞ্জাবী।"

মিঃ ঘোষ বললেন, "টাকার সঙ্গে দেশ ভ্রমণের কোন সম্বন্ধ নেই মা। ঔৎসুক্য ভরা ভ্রমণ বিলাসী মন থাকা প্রয়োজন।"

আমি বললাম, "তা যা বলেছেন মিঃ ঘোষ, এ দু'টি অন্ততঃ বাঙ্গালীর আছে।"

শ্রীনগরকে আমরা বহুক্ষণ ছেড়ে এসেছি। গ্রামীণ অঞ্চল দিয়ে আমাদের বাস চলেছে। হঠাৎ একটি হল্লা কানে এল। দেখি সামনের বাস থেকে ঠেলাঠেলি করে যাত্রীরা নেমে ছুটছেন।

আমাদের বাসেও হৈ-হৈ সুরু হয়েছে, "বাস রোখ, রোখ, রোখ্ যাও।" আমরা হতভম্ভ হয়ে সীটে বসে আছি। এমন কি হল যে যাত্রীরা নেমে এমন পালাচ্ছেন! হঠাৎ শুভ্রা ও ঝর্ণা কলরব করে আমাদের কাছে এসে হাত ধরে তাদের জানালার ধারে টেনে আনলো, তারপর বাইরে হাত দেখিয়ে সমস্বরে বললে, "দেখুন দেখুন কি মজা!"

প্রকৃতিস্থ হয়ে দেখি সত্যই তো কি অপূর্ব শোভা। এ তো আমাদের কল্পনায় কোনদিন আসে নি। দেখি বাস প্রায় খালি। আমারাও বাস থেকে নেমে দৌড় দিলাম সেদিকে।

দৌড়াতে দৌড়াতে ঝর্ণা হাসিমুখে মিঃ ঘোষকে বলল, "বাবা তোমরা তো বাস থেকে নেমে পড়েছ।"

মিঃ ঘোষ হকচকিয়ে বললেন, "ও তাই নাকি? কাশ্মীরে এসে অবাধ মেলামেশায় সব সময়ে বয়সের পার্থক্য থাকে না।"

পথের পাশে একটি আপেল বাগান। গাছভর্তি অজস্র পাকা আপেল বাগানটিকে মনোরম সৌন্দর্যে ভরিয়ে রেখেছে।

যাত্রীরা আনন্দের আতিশয্যে সকলে চারদিক দিয়ে বাগানে ঢুকে পড়ল।

'চটাপট্' 'পটাপট্' শব্দে যে যেমন পারল আপেল পেড়ে পকেট বা ঝোলা ভরাল।

এতগুলো লোকের একসঙ্গে এ ভাবে বাগানে ঢুকে পড়ায় প্রহরীরা প্রথমটায় ঘাবড়ে গিয়েছিল বেশ, তারপর তারা দলবেঁধে এসে আপেল পাড়া বন্ধ করে দিল এবং সাথে সকলকে বেশ দু' কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়ল না।

যাত্রীদের মধ্যে এখন কেউ বলছেন, "ভারি তো আপেলের দাম। বাজারে পাঁচ আনা সের, এখানে আপেল খায় কে?"

কেউ বললেন, "আরে গাছতলায় পড়েছিল, আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি।"

আবার কেউ বললেন, "হাতে ছোঁয়া মাত্র ঝরে পড়েছে আমরা কি ইচ্ছা করে পেড়েছি?"

এসব দেখে শুনে মিঃ ঘোষ একখানা দশটাকার নোট বার করে বাগানের জমাদারকে দিতে গেলেন। বললেন, "আমাদের কসুর হয়ে গেছে, এখন তোমরা এর ক্ষতিপূরণ নাও।"

আমি বললাম, "বল, আর কত দিলে খুশী হবে?"

জমাদার টাকা নিল না। আমাদের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে বলল, "সাহেব এজন্য আপনাদের কিছু দিতে হবে না। এ আপেল বিক্রীর জন্য নয়। মালিক নিজেদের খাবার জন্য রেখেছে। আমরা পাহারাদার। আপনারা বাগানে ঢুকে দেখুন, তবে আর যেন ফল পাড়বেন না।"

সকলে এবার বাগানের মধ্যে প্রবেশ করে খুশীমত বেড়াতে

লাগলেন। এ দৃশ্য আমাদের কাছে নূতন। এর পূর্বে আমাদের মধ্যে কেউ কোন স্থানে ফলসমেত আপেল বাগান দেখেন নি। মিঃ দাস ক্যামেরা বার করতেই মিঃ ঘোষ ছুটে আপেল গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

আমি বাগানের ভিতর এগিয়ে চললাম, কিছুদূর এসে দেখি ক্যামেরা হাতে নিয়ে মৃণালবাবু, শুভ্রা, স্বপ্না ও বৌদির সঙ্গে চলেছেন। অন্যদিকে মিঃ দাঁ ও মিঃ পাল ফটো তোলার জন্য তাঁদের আত্মীয়াদের আপেল পাড়া ভঙ্গিমায় পোজ নিচ্ছেন। বাগানের মধ্যে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আমরা আবার এসে বাসে উঠলাম। বাস ছেড়ে দিল।

মিসেস ঘোষ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "আচ্ছা সাত তাড়াতাড়ি উনি একখানা দশটাকার নোট বের করে ওদের দিতে গেলেন কেন? আমাদের দলের তো কেউ আপেল পাড়ে নি। তাছাড়া এখানে দশটাকায় তো একটা গোটা আপেল বাগান পাওয়া যায়।"

মিঃ ঘোষ বললেন, "দেখ এখানে বর্দ্ধমান, হুগলি, কলকাতা বলে আমাদের কোন পৃথক সত্তা নেই। বাংলার বাইরে সকলেই আমরা বাঙ্গালী। ভাল বা মন্দ যাই কিছু কর বাঙ্গালী হিসাবে গোটা প্রদেশকে সেটা স্পর্শ করবে, বাঙ্গালীর সুনাম ক্ষুণ্ণ হয় এ আমি চাই না।"

আমি মিসেস ঘোষকে বললাম, "বৌদি এ বিষয়ে আমি মিঃ ঘোষের সঙ্গে একমত। বাঙ্গালীর সম্মান রক্ষার জন্য মিঃ ঘোষ যা করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।"

বাসটি একটি সেতুর উপর দিয়ে ঝিলামকে পেরিয়ে এ পারে এসে থেমে গেল। কণ্ডাক্টার একটি টিন নিয়ে নদীতে জল আনতে দৌড় দিল। এই ফাঁকে কয়েকজন মহিলা নেমে পড়লেন। হঠাৎ সেদিকে দৃষ্টি যেতেই দেখি তাঁরা গাছতলায় এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছেন।

কৌতূহলবশতঃ তাঁদের কাছে এসে দেখি তাঁরা সকলে আখরোট কুড়াতে ব্যস্ত।

আমাকে দেখে শুভ্রা বলল, "কাকাবাবু কাছে এসে চুপ.সে বসে যান।"

ঝর্ণা বলল, "না শুভ্রাদি, কাকাবাবুকে এদিকে পাঠিয়ে দিন।"

নমিতা বলল, "না কাকাবাবু, আপনি আমাদের কাছে আসুন।"

বাস ওদিকে হর্ণ দিতে সুরু করেছে। আমার দৌড়াদৌড়ি সার হল, মাত্র কুড়ি পঁচিশটা আখরোট কুড়িয়ে দৌড়ে এসে বাস ধরলাম।

বাসে উঠে শুভ্রা ও ঝর্ণা তাদের এই নূতন আবিষ্কারে সকলকে চমক লাগিয়ে দেয়।

মিঃ ঘোষ আমাকে বললেন, "চলুন মিঃ চ্যাটার্জি, আমরা কিছু আখরোট কুড়িয়ে আনি।"

ঝর্ণা বলল, "বাবা আমরা যে ওখান থেকে প্রায় দু' মাইল এসে গিয়েছি।"

মিঃ ঘোষ বললেন, "তবে বাস থামলে এবার আর তোমরা নেমো না, আমরা আগে নেমে দেখবো কি আছে। আপেল আখরোট হাতছাড়া হয়েছে, এবার নিশ্চয়ই আঙ্গুর ক্ষেত পড়বে আমাদের ভাগ্যে।"

মিসেস ঘোষ বললেন, "সেই আশা নিয়েই এখন বসে থাক, তবে শেষ পর্যন্ত তাকে টক্ বলে না পস্তাতে হয়।"

সকলে এবার হেসে উঠলেন। বাস ক্রমাগত চড়াই-এর পথে উঠে চলেছে। হঠাৎ ঝর্ণা বলে উঠল, "বাবা দেখ দেখ, ঐ নীচে কেমন সুন্দর নীল জল?"

শুভ্রা আমাকে বলল, "কাকাবাবু তাহলে এটা নিশ্চয়ই উলার হ্রদ।"

মিঃ ঘোষ বায়নাকুলারে চারদিক দেখে আমার হাতে সেটা দিয়ে

বললেন, "মিঃ চ্যাটার্জি উলারে জেলেদের মাছ ধরা দেখুন, জালে প্রচুর মাছ পড়েছে।"

আমি বায়নাকুলারের সাহায্যে জেলেদের মাছ ধরা ও দূরে কয়েকটি হাউসবোট ও শিকারা দেখতে পেলাম। ঝর্ণা বায়নাকুলারটি চাইতে আমি ওর হাতে দিলাম।

শুভ্রা জিজ্ঞাসা করল, "কাকাবাবু হাউসবোট এখানে কেমন করে এলো? এখান থেকে শ্রীনগর তো বহুদূর।"

মিঃ দাস বললেন, "শ্রীনগর এখান থেকে মাইল কুড়ি হবে, আর হাউসবোটগুলি মোটরবোটের সাহায্যে টেনে এনেছে।"

বাস থামলে সকলেই এখানে নেমে পড়লেন। অমু আমাকে বলল, "কাকাবাবু, মা আপনাকে ওদিকে ডাকছেন।"

আমি অমুর সঙ্গে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বলছেন বৌদি?"

"আসুন না ঐ দিকটা একটু ঘুরে আসি।"।

আমরা কিছুদূর এসে উলারের পারে বসলাম। এ জায়গাটা কিছুটা সমতল। এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট নীচে গভীর নীল জল। শুভ্রা বসতে গেলে বৌদি বললেন, "তুই অত ধারে যাস্‌নে তো বাপু।" শুভ্রা সরে এসে স্বপ্নার পাশে বসল। স্বপ্না নীচে হাত দেখিয়ে বলল, "দাদা নীচে চেয়ে দেখুন।"

"কেন কি হয়েছে?"

শুভ্রা বলল, "কি সুন্দর বড় বড় সাদা পদ্মফুল ফুটে রয়েছে।"

আমি বললাম, "কাছে হলে আমি তোমাদের তুলে দিতাম।"

স্বপ্না বললে, "রক্ষা করুন, আমাদের ফুলে কাজ নেই।"

শুভ্রা বললে, "শিকারা পেলে যাওয়া যেত।"

বৌদি বললেন, "যে ঢেউ তাতে শিকারায় কি ওখানে যাওয়া যাবে?"

অমু বলল, "আর ফুলের উপর মৌমাছির ঝাঁক উড়ছে, না?"

স্বপ্না বলল, "ওমা সত্যই তো।"

শুভ্রা বলল, "এখান থেকে লোকেরা তাহলে পদ্মমধু নিয়ে যায়?"

ঘন ঘন বাসের হর্ণ বেজে উঠল। আমরা তাড়াতাড়ি করে এসে বাসে চড়ে বসলাম। বাস ছেড়ে উৎরাইয়ের পথে হু-হু করে নেমে চলল, কিছুদূর এসে অপর একটি হ্রদ দেখে শুভ্রা ও ঝর্ণা এর নাম জিজ্ঞাসা করল। মিঃ দাস বললেন, "এর নাম মানসবল।"

ঝর্ণা বলল, "বেশ সুন্দর নাম তো?"

শুভ্রা বলল, "আর এর পাশেপাশের দৃশ্য আরও সুন্দর।"

ঝর্ণা বলল, "বিশেষ করে নীলজলে পাশাপাশি সাদা ও লাল পদ্মগুলি অপূর্ব বলে মনে হচ্ছে।"

স্বপ্না বলল, "এর প্রাকৃতিক পরিবেশই ভিন্ন, বাস্তবে এ রকমটি আর কোথাও দেখি নি।"

ড্রাইভার বাসের গতি কমিয়ে কিছুদূর এসে থেমে গেল। অল্পক্ষণ থেমে আবার ছেড়ে দিল। বাসে বসে দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চললাম। দুপুরের কিছু আগে আমরা 'ক্ষীরভবানী' পৌঁছে বাস থেকে সকলে নেমে পড়লাম। কিছুদূর পায়ে হেঁটে এসে দেখি এক জায়গায় লোকে লোকারণ্য। কাশ্মীরী হিন্দু মহিলারা থরে থরে দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে পূজা ও অঞ্জলি দিতে ব্যস্ত। আমার চঞ্চল মন নিমেষে ভেসে যায় সুদূর বাংলার এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে, হুগলি জেলার পাটুলীগ্রামে, আবাল্য পালিত মামার বাড়ির 'মঠের মার' পূজোর দালানে। 'মঠের মার' মূর্ত্তি মনে জাগে। আত্মীয় স্বজনদের কথা মনে পড়ে।

অঞ্জলি দেব বলে আমিও তাড়াতাড়ি ফুল কিনে এগিয়ে যাই। পুরোহিতের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হ'তেই ইঙ্গিতে কাছে ডেকে বসতে বললেন। কিন্তু বসবার স্থান কোথায়, চারদিকেই তো কাশ্মীরী মহিলাদের ঠেলাঠেলি।

তাঁদের কাছে বসতে মনে সঙ্কোচ জাগে। একে বিদেশী, তায় পুরুষ, তার উপর এঁদের তুলনায় নিজে কতই না অসুন্দর।

ভিন্ন দেশীয় নারীদের ভিড়ের মধ্যে এসে শীতের দিনেও নাক কান গরম হয়ে গেল। বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে বেকুবের মত চেয়ে থাকি কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে।

মনে হয় আমার অবস্থা 'মা ক্ষীরভবানী'র অন্তর স্পর্শ করে। তাই এভাবে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এক তরুণী উঠে উর্দু ভাষায় তাঁর আসনে আমাকে বসবার অনুরোধ করলেন। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে টুক্ করে বসে পড়লাম। তিনিও আমার পাশে একই আসনে বসলেন। আমি আমার ডান ও বাঁ পাশের মহিলাদের চাপে বেশ সঙ্কোচ ও অস্বস্তি বোধ করছি।

পুরোহিতের অনুরোধে ভদ্রমহিলা আমার নাম ও গোত্র জেনে তাঁকে বললেন। জলপাত্র দেখিয়ে আমাকে আচমন করতে বললেন। প্রতিবার অঞ্জলি দেবার জন্য আমার হাতে পুষ্পার্ঘ্য তুলে দিয়ে সাহায্য করলেন, কিন্তু পুরোহিতের কোন মন্ত্রই আমার বোধগম্য হল না। ভগবতীর প্রণামের মন্ত্র আমার জানা থাকায় কয়েকটি কথা বুঝতে পেরে আমি নিজেই সমস্তটা আবৃত্তি করে ভূমিষ্ঠ হয়ে মাকে প্রণাম করলাম।

অঞ্জলি শেষ হলে কত দক্ষিণা দিতে হবে আমি মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করে বললেন, "আপনার যা অভিরুচি দিতে পারেন, কিছু না দিলেও উনি কিছু মনে করবেন না।"

মাত্র চার আনা পয়সা দক্ষিণা দিলাম। পুরোহিত খুশী হয়ে সেজন্য আবার দক্ষিণান্তর করলেন। মহাষ্টমীর দিন মাকে অঞ্জলি দিতে পারায় মন আনন্দে ভরে ওঠলো। ভিড় ঠেলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসি। কপাল থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে পড়ে।

বাইরে এসে হঠাৎ মনে পড়ে তাইতো—আসবার সময় ভদ্র-মহিলাকে তো কিছু বলা হয় নি। তাঁর কাছে ফিরে যাবার জন্য পিছন ফিরে দাঁড়াই, কৃতজ্ঞতা না জানানোয় মনে অনুশোচনা জাগে ভীষণ।

"এখানে একা দাঁড়িয়ে কেন বাবা?" পীঠের উপর হাতের চাপ পেলাম। পিছনে ফিরে দেখি জ্যেঠামশায়। তাড়াতাড়ি প্রণাম করে পায়ের ধূলা নিলাম।

"আরে এইতো—দাদা ও জ্যেঠামশায় এখানে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন।" স্বপ্নার কথা আমাদের কানে এল। পরক্ষণেই রূপেন ও স্বপ্না আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল।

রূপেন বলল, "দাদা কোথায় ছিলেন এতক্ষণ, আমরা এদিকে আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।"

আমি অঞ্জলি দেবার ঘটনাটি সংক্ষেপে এঁদের বললাম।

স্বপ্না বলল, "জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে এখানে এ ভাবে যে হঠাৎ দেখা হবে তা ভাবতে পারি নি কোনদিন।"

"তিন বছর হল ঠিক এই মহাষ্টমীর দিনে এখানে যে তোমার জ্যেঠাইমাকে অনিচ্ছায় ছেড়ে যেতে হয়েছে মা। তাই যেখানেই থাকি আজকের দিনে প্রতিবছর কে যেন আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে হির্ হির্ করে এখানে টেনে আনে।"

গভীর সহানুভূতির সঙ্গে স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছিল জ্যেঠাইমার?"

"সুস্থ মানুষ, মা ক্ষীরভবানীর পূজো দিয়ে এসে হঠাৎ হার্টফেল্ করলেন।"

আমরা চুপ করে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, "আমি চলি মা, আজই আমাকে

পাঠানকোট রওনা হতে হবে, আর একদণ্ড এখানে তিষ্ঠোলে চলবে না।"

আমরা সকলে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি একটু অপেক্ষা করে কেমন ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় নিজেকে নিজেই যেন বলে চললেন, "বৃদ্ধ বয়সে পত্নীহারাবার যে কি জ্বালা তা ঠিক বোঝাবার নয় মা।"

আক্ষেপ করতে করতে তিনি দ্রুত পায়ে চলে গেলেন। আমরা স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে স্বপ্না বলল, "ঋষিতুল্য মানুষের কি গভীর পত্নীপ্রেম! ওঁর অবস্থা দেখলে চোখ ফেটে জল আসে।"

আমি বললাম, "জ্যেঠামশায়ের অবস্থা দেখলে দাদুর কথা মনে পড়ে যায়।"

স্বপ্না বলল, "দাদু কে দাদা ?"

"আমার ভারততীর্থ সাথী শ্রীপবিত্রকুমার চট্টোপাধ্যায়। বেহালায় বাড়ি,অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার। প্রায় আশির কাছাকাছি হবে বয়েস।"

"তিনিও বুঝি বিপত্নীক ?"

"হ্যাঁ, তবে তাঁর তিন মেয়ে ও এক ছেলে আছে।"

"কে জানে জ্যেঠামশায়ের ছেলেপিলে কিছু আছে কি না!" স্বপ্নার দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

বাসে চেপে আমাদের হোটেলে ফিরতে চারটে বেজে গেল। বিশ্রামের সাথে জলযোগ সেরে সন্ধ্যার পর আমরা পাঁচ মাইল দূরে মিলিচারী ক্যাম্পে দুর্গাপূজা দেখতে রওনা হলাম।

ছাউনীর চারিদিকে বৈদ্যুতিক আলোকমালা ঝলমল করছে। ব্যাণ্ডের সাথে বিউগিল যোগ দিয়ে পরিবেশকে গাম্ভীর্যপূর্ণ করে তুলেছে। পুষ্পলতায় ঘেরা তোরণ দ্বারে এসে বাস থেমে গেল। বাস থেকে নামবার সাথে সাথে আমরা স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হয়ে ভিতরে এলাম।

এতগুলি বাঙ্গালীকে একসঙ্গে পূজামণ্ডপে উপস্থিত দেখে কর্তৃপক্ষীয়রা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। শিষ্টাচারের সহিত সকলকে প্রতিমার সামনে নিয়ে এলেন। আমরা আরতি দেখতে লাগলাম। আরতি অন্তে দশভূজামূর্তিকে প্রণাম করে আমরা ধন্য হলাম।

বাংলা ছেড়ে দেড় হাজার মাইল দূরে মহাষ্টমীর দিনে দুর্গা প্রতিমা দর্শনে সকলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। পুরোহিতের নিকট চরণামৃত ও প্রসাদ নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেকেই হিন্দী নাটক পরশুরাম অভিনয় দেখতে চলে গেলেন। আমি কর্তৃপক্ষীয়দের সাথে বসে আলাপ সুরু করলাম। সামনের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, "এবার বলুন স্যার, আপনার বাড়ী কোথায় ?"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "বাংলাদেশে।"

"সেটা তো স্বতঃসিদ্ধ, বলবার প্রয়োজন ছিল না, তারপর ?"

"তারপর কোলকাতায়।"

"আরও একটু পরিষ্কার করে আর এক ধাপ উঠুন স্যার।"

ভদ্রলোক এবার হেসে বললেন, "কোলকাতার বড় জোর আপনারা শ্যামবাজার ভবানীপুর বা বালিগঞ্জ চিনবেন, এগুলি ছাড়া অন্য কিছু বললে কি চিনতে পারবেন ?"

হেসে বললাম, "বলেই দেখুন না, নিজের দৌড়টা একবার দেখে নেই।"

উপস্থিত সবাই এবার হেসে উঠলেন।

ভদ্রলোক এবার ঢোক গিলে বললেন, "ঠিক কলকাতা নয়, হুগলি জেলার কোন্নগরে। চিনবেন কি ?"

"একটু সবুর করুন।" কথাটি বলে আমি রূপেনকে বললাম, "মিঃ দাঁ ও মিঃ পালকে আমার নাম করে একবার ডেকে আনো তো।"

রূপেনের কথা শুনে মিঃ দাঁ ও মিঃ পাল এসে বললেন, "কি ব্যাপার মিঃ চ্যাটার্জি ?"

আমি বললাম, "আপনারা তো রিষড়ার, আর এঁরা হচ্ছেন কোন্নগরের, দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা।"

মিঃ দাঁ কিছু বলবার আগেই এঁদের মধ্যে একজন বললেন, "মিঃ দাঁ-কে তো খুব চিনি, কতদিন ফ্রী পাসে ওঁদের হলে সিনেমা দেখে এসেছি।"

এবার একটা হাসির ঢেউ উঠল।

আমাকে যিনি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তাঁকে লক্ষ্য করে মিঃ পাল বললেন, "তুমি প্রবোধের ভাই প্রভাস না?"

ভদ্রলোক মুখে হাসি চেপে বললেন, "কেমন আছেন শৈলেন-দা?"

চারদিক থেকেই হো হো করে সকলে হাসতে স্বরু করেছেন। ক্রমশঃ এঁদের সকলের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেল। রাত্রে ভদ্রলোকদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তাঁরা পরের দিনের নবমীর প্রসাদ গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। মিঃ ঘোষ ও মিঃ দাস বললেন, "কালকে আমাদের প্রোগ্রাম না জানা পর্যন্ত আমরা আপনাদের কথা দিতে পারি নে।"

প্রভাসবাবু বললেন "তাহলে সন্ধ্যার পর এখানে সকলে জলপানি প্রসাদ পেয়ে আমাদের কালিন্দী নাটকের অভিনয় দেখবেন, কারণ বাঙ্গালী শ্রোতা না পেলে নাটক আমাদের ঠিক জমবে না।"

ওঁদের কথা শুনে আমরা সকলে খুব হাসলাম। মিঃ ঘোষ বললেন, "কাশ্মীরে যে দুর্গাপূজা হয় এটা আমরা জানতাম না, তাহলে গতকালই এখানে এসে ভিড় করতাম।"

প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক বললেন, "এবার নিয়ে দুর্গাপূজা চার বছরে পড়ল। প্রথম মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাঙ্গালী সৈনিক নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে শ্রীনগর ক্যাম্পে প্রথম দুর্গাপূজার পত্তন করেন, এখন অবশ্য ভারত সরকার এর যাবতীয় ব্যয় ভার গ্রহণ করে থাকেন।"

প্রভাসবাবু বললেন, "শৈলেনদা, আমরাই সব কামার, কুমোর, পুরোহিত, আর ঢাকি ঢুলি তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।"

কথাটি বলে তিনি হাসতে হাসতে ব্যাণ্ডপার্টিটিকে দেখিয়ে দিলেন। চারদিক থেকেই এবার হাসির বন্যা দেখা দিল। আমরা তাঁদের আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে খুশী হয়ে পরের দিন সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বিদায় নিলাম। পরদিন দুপুরে বৌদি এসে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে শুভ্রা। স্বপ্নাকে লক্ষ্য করে বললেন, "ঠাকুরজামাই কাল কি লিখেছেন একবার দেখাও তো ভাই, কি কি দেখেছি মনে মনে তা একবার মিলিয়ে নিই।"

স্বপ্না খাতা এনে শুভ্রার হাতে দিল। শুভ্রা পড়তে সুরু করল, "উলার যাবার পথে শ্রীনগর ছেড়ে মাইল বার এসে গ্রামীণ নির্জনতার মধ্যে হঠাৎ একটি আপেল বাগিচা আমাদের দৃষ্টি পথে পড়ল। ফল সমেত আপেল বাগিচা আমাদের নিকট এই প্রথম। অন্য যে কোন ফল বা ফুল বাগিচার সৌন্দর্য এর কাছে যেন ম্লান হয়ে যায়। সৌন্দর্যের তাড়নায় সকলে বাস থেকে নেমে বালকসুলভ চপলতায় বাগানে প্রবেশ করলাম।

"সকলে ফটো তোলায় ব্যস্ত হলে আমি আপন মনে একাকী বাগানের মধ্যে এগিয়ে চললাম। চারদিক থেকেই সুমিষ্ট গন্ধ ভেসে আসতে লাগলো। কিছুদূর অগ্রসর হলে ভিতরের একটি হাস্য কোলাহল আমার কর্ণে প্রবেশ করল।

"কৌতূহলী হয়ে দৃষ্টি ফেরাতেই কয়েকটি কাশ্মীরী বালার আপেল চয়নের দৃশ্য আমার নজরে পড়ল। এ দৃশ্য অভিনব। আমি অনিমেষে তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"পৃথিবীর অন্য স্থানে এ দৃশ্য সম্ভবপর নয়। রঙিন সুপক্ক আপেল বৃক্ষগুলি ফলভারে নত হয়েছে। সুবিধা পেয়ে কাশ্মীরীবালারা

বৃক্ষ শাখায় আরোহণ করেছেন। সুপক্ক আপেলের সুগন্ধে তাঁরা উৎফুল্ল হয়ে গেছেন। নিজেদের গাত্র বর্ণের সাথে আপেলের রং মিশে গেছে দেখে তাঁরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে প্রকৃতির কাছে নিজেদের সৌন্দর্যের পশরা উন্মুক্ত করে কলহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছেন। সুযোগ বুঝে আপেলগুলি সুন্দরীদের প্রতি অঙ্গের উষ্ণ পরশ মনের আনন্দে উপভোগ করছে।

"এই জন্যই তো কাশ্মীরী আপেলের এত রূপ। ধনীরা আপেলের সাথে অন্য পরশের স্বাদ পান, তাই তো আপেলের এত আদর কলকাতায়।

"পুনরায় বাসে চেপে বেশ কিছুদূর আসার পর উলার হ্রদ আমাদের দৃষ্টিপথে দেখা দিল। সমগ্র এশিয়ার মধ্যে উলারই একমাত্র মিষ্ট জলের শ্রেষ্ঠতম হ্রদ।

"গ্রীষ্মে উলার প্রায় পনের বর্গমাইল জলপূর্ণ থাকে। চঞ্চল ঝিলাম নদী উলারের এক পারে ডুব দিয়ে অবগাহন অন্তে অপর পারে উঠে সর্পিল গতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের পথে অদৃশ্য হয়ে সিন্ধু নদীতে গিয়ে লীন হয়েছে।

"উলারের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পর্বতমালা স্তরে স্তরে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হয়ে তাকে স্পর্শ করেছে। এই স্থানে উলার গর্ভ থেকে প্রস্রবণের জল বুদ্‌বুদ্‌ কেটে তীব্র বেগে নিঃসৃত হচ্ছে। হ্রদের মধ্যস্থলে সুগভীর জলরাশি তরঙ্গমালার দ্বারা উদ্বেলিত। এখানে শিকারায় গমনাগমন বিপদসঙ্কুল ও সব সময় নিরাপদ নয়।

"উলার ছেড়ে কিছুদূর এসে আমরা অপর একটি হ্রদ মানসবলের সন্নিকটে এলাম। বাস থেমে গেল। আমরা কিছুক্ষণের জন্য অনিমেষ নয়নে এই হ্রদটির দিকে চেয়ে রইলাম। স্থানীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোরম। হ্রদটির মধ্যস্থলে উভয় পার্শ্ব থেকে পর্বতমালা ক্রমশঃ

সঙ্কীর্ণ হয়ে নিম্নে এসে দুই বাহু দ্বারা তাকে আলিঙ্গনের ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছে।

"হ্রদটি দৈর্ঘে দু'মাইল। হ্রদে নীলাভ নির্মল জলে নৃত্যরত উর্মি-মালার আলিঙ্গনে মৃণালদল আন্দোলিত। প্রস্ফুটিত শুভ্র শতদলের উপর মধুকর বিশ্রাম লাভের জন্য শত চেষ্টায় বিফল মনোরথ হয়ে ক্রোধ ভরে গুঞ্জরিত অবস্থায় ঝাঁকে ঝাঁকে উড্ডীয়মান। সুযোগ বুঝে কালো ভ্রমর চুম্বন লালসায় লোভাতুর হয়ে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু পঙ্কজদল প্রতিবারে সরমে হিল্লোলিত হয়ে ইতস্ততঃ স্থান পরিবর্তনে অনিচ্ছা প্রকাশ করছে।

"উষা অবসানে শারদীয়া রাঙা প্রভাতে স্থানীয় দৃশ্য অভিনব। তখন 'মানসবল' অপরূপ হয়ে ওঠে। আমরা এই প্রাকৃতিক পরিবেশ ছেড়ে অনিচ্ছায় বাসে করে এগিয়ে চললাম। এখান থেকে শ্রীনগরের দূরত্ব আঠার মাইল।

"কিছুক্ষণ পরে আমরা ক্ষীরভবানী পৌঁছে বাস থেকে নেমে পড়লাম। চিনার বীথির সুশীতল উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের চতুর্দিকে লৌহ বেষ্টনী। তার পাশ দিয়ে শীর্ণকায় এক স্রোতস্বিনী রূপালী ধারায় ঝির ঝির শব্দে বয়ে চলেছে। প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে একটি বাঁধান বেদী। তার চারিপার্শ্বে সুগভীর জলপূর্ণ খাদ। বেদীর উপর পুরোহিতগণ ষোড়শোপচারে মাতৃপূজায় রত।

"সেখানে তিল ধারণের স্থানাভাব। খাদের পশ্চাতের আর একটি বেষ্টনী। বেষ্টনীর বহির্দেশে বৃত্তাকারে পুরোহিতের সারি। তাঁদের সম্মুখে শত শত কাশ্মীরী মহিলা পূজা ও অঞ্জলি দিতে তৎপর। প্রাঙ্গনের চারিদিকে ব্রাহ্মণগণ হোম, যাগ-যজ্ঞ ও চণ্ডীপাঠে মুখর।

"শুচিবস্ত্র পরিহিত হয়ে নানান দ্রব্যসম্ভার ও পুষ্পমাল্যসহ কাশ্মীরী দেবীরা সুদূর পল্লী অঞ্চল থেকে এখানে সমবেত হয়ে মা ক্ষীরভবানীর শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন।

"এ যে তাঁদের বংশগত প্রথা। পূজার কয়দিন দেবীকে তাঁরা পূজায় পরিতুষ্ট করে স্বামী-পুত্র ও পরিবারের জন্য মাঙ্গলিক কামনা করে যান।

"মনে হচ্ছে হঠাৎ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করে চারিদিকে দেবী দর্শন করছি। ভাগ্যবান দাদা, আমাদের দলের আশি জনের মধ্যে তিনিই একমাত্র—যিনি আজকের দিনে মার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে সক্ষম হয়েছেন।

"প্রবাদ আছে সীতাহরণের পর দেবী ভবানী রুষ্ট হয়ে লঙ্কাধিপতিকে চিরতরে পরিত্যাগ করে এইস্থানে চলে আসেন। বাসন্তীপূজার সময় দেবীর নীচে চতুষ্পার্শ্বস্থিত জলরাশি ক্ষণে ক্ষণে হরিদ্রা, পীত, জাফরাণ ও দুগ্ধ বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে মা ক্ষীরভবানী তাঁর ভক্তবৃন্দকে দর্শন দেন। শ্রীনগর থেকে পনেরো মাইল দূরে তুল্লামুলা নামক স্থানে দেবী ক্ষীরভবানী অবস্থিত।

"ভক্তবৃন্দ দলে দলে এসে মার শ্রীপাদপদ্মে অন্তর উজাড় করে দেয় শত কামনা বাসনার পুষ্পাঞ্জলি! চারিদিকে আকুল প্রার্থনা ও ভক্তির বন্যা বয়ে যায়। বেদনার ভার লাঘব করে ফিরে যায় পরিতৃপ্তির আনন্দাশ্রুলোচনে। আমরাও ফিরে চলি মনের আনন্দে।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আজ মহা নবমী। কাশ্মীরের দ্রষ্টব্যস্থলের অধিকাংশই আমাদের দেখা হয়ে গেছে। ছুটিও প্রায় শেষ হয়ে এল। মনে করলাম বাকি দিনগুলি ডাল ও ঝিলামের সংস্পর্শে এসে ঘনিষ্ঠ হব। স্থির করলাম আজ সকালে ঝিলাম ও সন্ধ্যায় ডালের আতিথ্য গ্রহণ করব।

চায়ে চুমুক দিচ্ছি, হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল, ইংরাজীতে প্রশ্ন, "ভিতরে আসতে পারি মহাশয়?"

অনুমতির সঙ্গে ভিতরে এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল কাশ্মীরী হাউসের এক কর্মচারী। সবিনয়ে বলল,"আপনারা পুনরায় ফ্যাক্টরী দেখতে যাবেন শুনে মুস্তাফা সাহেব খুশী হয়ে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন।"

স্বপ্না কর্মচারীকে বলল, "উপরতলার এক মেম সাহেব আমাদের সঙ্গে যাবেন, তাঁকে যে সংবাদ দিতে হবে।"

কর্মচারীটি বলল, "তাকে সংবাদ দিয়েই আমি এখানে এসেছি, ওঁরা আপনাদের জন্য লনে অপেক্ষা করছেন।"

স্বপ্না বলল, "তবে চলুন দাদা আর দেরী নয়।"

আমরা সকলে গেট পার হয়ে রাস্তায় এলাম। স্বপ্না বলল, "দাদা আজ আমরা ডাল থেকেই শিকারায় উঠে ঝিলামে যাব।"

শুভ্রা বলল, "পিসি খুব সুন্দর প্লান।"

কর্মচারীটি বলল, "কলগেট খুলতে এগারোটা বেজে যাবে। এত দেরী করবেন?"

স্বপ্না বলল, "তবে থাক। এতক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।"

আমরা টাঙ্গায় করে ঝিলামে এসে শিকারায় চাপলাম।

চপল হাস্যে নৃত্য সুরু করে ঝিলাম ছন্দের তালে তালে এগিয়ে চলল।

নদীর দুই তীরেই কাশ্মীরের ঘন বসতিপূর্ণ কাঠের বাড়ি। মধ্যে মধ্যে বাংলো ধরনের ইমারত। নদীর উপর হাউসবোট ও পারের দু'ধারে অসংখ্য কাশ্মীরী বালারা বাসন ও কাপড় পরিষ্কারে ব্যস্ত। প্রায় মাইল দুই এসে তীরে একটা মন্দির দেখিয়ে শুভ্রা প্রশ্ন করল, "এখানে এটা কিসের মন্দির কাকাবাবু?"

উত্তরে বললাম, "হিন্দুদের প্রসিদ্ধ দেবতা রঘুনাথজীর মন্দির, তোমরা প্রণাম কর।"

স্বপ্না বলল, "কত বড় ও কি সুন্দর, শুনেছি রঘুনাথজী জাগ্রত দেবতা।"

ওরা হাত জোড় করে সকলে প্রণাম করল।

রূপেন বলল, "শত বৎসর পূর্বে স্থাপিত এই মন্দিরটি ডোগরা রাজার এক অক্ষয় কীর্তি। আর মন্দির সংলগ্ন ঐ সৌধটি পুরাতন রাজপ্রাসাদ।"

স্বপ্না বলল, "রাজাদের কীর্তিকলাপের ধরনই আলাদা। প্রসাদের পাশেই পূজা বাড়ি।"

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা শিকারা থেকে নেমে কাশ্মীরী হাউসে ঢুকে ফ্যাক্টরী দেখতে সুরু করলাম। শুভ্রা তন্ময় হয়ে পর পর কার্পেট ও শাল ফ্যাক্টরীগুলি দেখে চলেছে। স্বপ্না, অমু ও মৃণালবাবু শুভ্রার সঙ্গে চলেছেন। আমি আর রূপেন ইতস্ততঃ ঘুরে দেখছি।

শুভ্রা কখন বলছে "ওয়াণ্ডারফুল", কখনও বলছে "মারভেলাস", কখনওবা "কি সুন্দর" বলে আমাদের মুখের দিকে চাইছে। স্বপ্নাও সেই সঙ্গে আমাদের দিকে ফিরে মিষ্টি হাসছে। প্রায়

ঘণ্টা খানেক দেখার পর আমরা উপরে এলাম। বৃদ্ধ মুস্তাফা-সাহেব দরজায় এসে আমার দু'হাত জড়িয়ে বললেন, "আজ আপনাদের মাংস ও পরোটা না খাইয়ে ছাড়ছি নে।"

আমি স্বগত বললাম, "তবেই হয়েছে তাহলে সকালে যা খেয়ে এসেছি সেটাও বমি হয়ে যাবে।"

শুভ্রা চুপি চুপি বলল, "ও কথা বলতে নেই কাকাবাবু, এখানে মিথ্যা বললে ক্ষতি হবে না।"

স্বপ্না তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "মুস্তাফা সাহেব এইমাত্র যে আমরা খেয়ে এসেছি। আজ থাক, অন্য যে কোন একদিন এসে আপনার বাড়িতে খেয়ে যাব।"

স্বপ্নার কথায় খুশী হয়ে মুস্তাফা সাহেব চেয়ার দেখিয়ে স্বপ্না ও শুভ্রাকে বসতে অনুরোধ করলেন। তারা বসলে আমাদের বসিয়ে তবে তিনি অন্য আর এক আসন গ্রহণ করলেন।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে গভীর মনোযোগ দিয়ে সুক্ষ্ম শিল্পসম্ভার দেখে শুভ্রা বলল, "এবার ফেরা যাক কাকাবাবু।"

স্বপ্না বলল, "মুস্তাফা সাহেবের এ অফুরন্ত ভাণ্ডার দেখে আমরা কোনদিনই শেষ করতে পারব না।"

শুভ্রা হেসে যোগ করল, "আর আশাও আমাদের মিটবে না।"

মুস্তাফাসাহেব বাংলা না বুঝলেও আমাদের হাবভাবে কিছু অনুমান করে হাসলেন। আমরা সকলে উঠে ঘরের বার হলাম। মুস্তাফাসাহেব সিঁড়ি পর্যন্ত এসে আমাদের সকলকে সসম্ভ্রমে সেলাম দিলেন। তাঁর কর্মচারী আমাদের শিকারায় উঠিয়ে সেলাম দিয়ে বিদায় নিল। অমু শুভ্রাকে বলল, "দেখ দিদি, এখানে কত জায়গায় তো আমরা বেড়ালাম, কিন্তু কোনদিন একটা রোগা বা হ্যাংলা ছেলেমেয়ে দেখতে পেলাম না।"

শুভ্রা একটু হেসে জবাব দেয়, "এখানে রোজ এরা কত

ভাল ভাল ফল খায় বল দেখি। আপেল, আখরোট, ডালিম পেলে দেখতিস্ আমাদের এ রোগা হাড়েও একদিন মাংস লাগতো।"

স্বপ্না বলল, "তার উপর মাছ, মাংস তো আছেই।"

মৃণালবাবু বললেন, "তাছাড়া এখানে ভেজালের বালাই নেই। বিশুদ্ধ ঘি, জাফরাণ এরা ভালভাবে পেট পুরে খায়।"

রূপেন বলল, "এখানে প্রচুর ফল হয়। সেজন্য গরীব দুঃখীদেরও ভাগে কিছু কিছু এসে জোটে। নদীর ধারে যারা থাকে মাছও তাদের ভাগে কিছুটা জোটা সম্ভব, অবশ্য মাংস এখানে তেমন সস্তা নয়, সে প্রায় আমাদের দেশের মতই দামি। সাধারণ লোকের পক্ষে মাংস খাওয়া সম্ভব নয়। আর গাওয়া ঘি খাবার পয়সা পাবে কোথায়। তবে ছাগলের দুধ, মুরগীর ডিম, মাংস খেতে পায় বেশ।"

স্বপ্না আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চাইল। আমি বললাম, "রূপেনের কথা ঠিক। এখানে ভেড়া বা ছাগলের দাম আছে। ছাগল ভেড়ার লোম বেচেই তো এদের বছরের অর্দ্ধেক পেটের ভাত হয়। তাছাড়া কাশ্মীরে গরু কাটা নিষিদ্ধ। আর দালদার প্রবেশ নিষেধ। গাওয়া ঘি অবস্থাপন্ন লোকেরা ব্যবহার করে বটে তবে অমন স্বাস্থ্য স্রেফ জল হাওয়ার গুণে। তবে কাশ্মীরীরা পোলাও, মাংস, পরোটা খুব সুন্দর ভাবে রান্না করতে পারে এবং খেতেও জানে।"

আমার কথা শুনে সকলে হেসে উঠল। স্বপ্না বলল, "আপনি তো নিরামিষাশী জানতাম তবে ওদের রান্নার স্বাদ পেলেন কেমন করে?"

শুভ্রা বলল, "মুস্তাফা সাহেব ভাগ্যিস কাকাবাবুর কথা বুঝতে পারে নি"

স্বপ্না বলল, "দাদার ঐ স্বভাব। মনে যা আসবে দড়াম করে মুখের উপর বলে দিলেই হলে।"

আমি বললাম,"মুস্তাফা সাহেব বাংলা বোঝেন না বলেই কথাটা আমি বলেছিলাম। আর এদের রান্নার কথা মিঃ ঘোষের কাছ থেকে শুনেছি। মিঃ ঘোষ ও মিঃ দাস সে রাত্রি পাহলগাঁও-এর 'ওয়াজীর হোটেলে' মাংস পরোটা খেয়েছিলেন। ওঁরা বললেন, খুব সুস্বাদু ও উচ্চস্তরের রান্না।"

হোটেলে ফিরতে বেলা বারোটা বেজে গেল।

শুভ্রা বলল, কাকাবাবু আজ বিকেলে কিন্তু আমাদের ডালে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে।"

আমি বললাম, "রাজী আছি তবে একটু সকাল সকাল।"

"বেশ আমরা তৈরী থাকব। আপনি ঠিক তিনটের সময় আমাদের ঘরে আসবেন "

আমি ঘড়ি ধরে ঠিক তিনটের সময় শুভ্রার ঘরে টোকা দিতেই অমু বলল, "ভিতরে আসুন কাকাবাবু।"

ঘরে ঢুকে দেখি শুভ্রা হাত জোড় করে বৌদিকে বলছে, "মা মিনতি করছি তোমাকে, এভাবে তুমি বাবাকে আর ফতুর করো না।'

অমু বলল, "মা আমি বলছি তোমার যা যা কিনবার ইচ্ছে সব কিনে নাও।"

শুভ্রা রাগত অমুকে বলল, "আমার আর কি? টাকা থাকলে তোদেরই থাকবে ভাই।"

আমি হেসে বললাম,"বৌদি আপনিও কি রেগে গেছেন নাকি?"

বৌদির মুখে হাসি ছিল। তিনি বললেন "না ভাই, বড় লোকের মেয়ের মত যখন তখন আমি রাগি না।"

শুভ্রা বৌদির দিকে ফিরে বলল, "নিশ্চয়ই তো আমি বড় লোকের মেয়ে ও বড় লোকের বৌ। আমার রাগ হওয়া স্বাভাবিক।" পরক্ষণই হেসে নরম হয়ে আব্দারের সুরে বলল, "চল না মা, কাকাবাবুকে আমি কথা দিয়েছি সকলে মিলে আজ ডালে বেড়াতে যাব।"

শুভ্রা একখানা চেয়ার তোয়ালে দিয়ে মুছে আমার দিকে এগিয়ে বলল, "কাকাবাবু বসুন এখানে। আমরা সব তৈরী, এখুনি বেরুব।"

আমি বসলে শুভ্রা হাসতে হাসতে বলল, "কাকাবাবু আমি মা'র কম্বাইণ্ড কেশিয়ার ও একাউন্‌টেন্ট। আচ্ছা আপনি বলুন তো কাকাবাবু, কাশ্মীরে এসেছি বলে কি দেশশুদ্ধ লোকের জন্য শাল কিনে নিয়ে গিয়ে দাতব্য করতে হবে?"

আমি বৌদির দিকে চেয়ে হাসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা সকলে ডালে এসে শিকারায় চাপলাম।

শুভ্রা বলল, "কাকাবাবু আজ কোনদিকে যাওয়া হবে?"

স্বপ্না জানাল, "আজ 'নেহেরু পার্ক' ও 'চার চিনার' দেখতে যাব।"

শিকারা শন্ শন্ শব্দে পাঁচ মিনিটের মধ্যে 'নেহেরু পার্কে' এসে ভিড়ে গেল। আমরা সকলে নেমে পড়লাম। শুভ্রা বলল, "পার্কটি ঠিক যেন ছবির মত দেখতে।"

স্বপ্না বলল, "বিশেষ করে সবুজ উদ্যানে বিশ্রামের স্থানটি।"

বৌদি বললেন, "চারদিকে ফুলের প্রাচুর্যে আরও মনোরম দেখাচ্ছে।"

মৃণালবাবু স্বপ্নাকে বললেন, "চলুন বৌদি পার্কে বসে কিছুক্ষণ হাওয়া খাওয়া যাক।"

শুভ্রা বলল, "সেই ভাল পিসি তোমরা বসে হাওয়া খাও, আমি ততক্ষণে মাকে হাউসবোট দেখিয়ে আনি।"

তারপর আমাকে বলল, "কাকাবাবু আপনি আসুন, আপনি না গেলে চলবে না।"

আমরা একটি হাউসবোটের কাছে আসতে শুভ্রা ওঠবার জন্য অনুরোধ করল এবং নিজের কথা শেষ করতে না করতে নিজেই গিয়ে ঠেলে উঠতে সুরু করল।

আমরা আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে আবার শিকারায় উঠলাম। অমু, রূপেন, স্বপ্না ও মৃণালবাবু শিকারায় উঠলে শিকারা কিনারা ছেড়ে আবার এগিয়ে চলল।

অমু জিজ্ঞাসা করল, "হাউসবোট কেমন দেখলে মা।"

বৌদি বললেন, "সুন্দর বিলি ব্যবস্থা, ঠিক যেন হোটেলের মত, আবার ওর মধ্যে ফোনও আছে দেখলাম।"

স্বপ্না বলল, "হাউসবোটগুলিকে মুভিং হোটেল বলা যায় আর কি।"

রূপেন বলল, "ভেবে চিন্তে নামকরণটা করেছ বেশ।"

সকলে হেসে উঠলাম। অতি অল্প সময়ে শিকারাটি অপর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে এসে ভিড়ল। বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন, "এর নাম বুঝি চার চিনার?"

অমু বলল, "দেখছ না বড় বড় চারটে চিনার গাছ রয়েছে এখানে।"

স্বপ্না হেসে বলল, "হায়দ্রাবাদে যেমন 'চার মিনার' এখানে তেমনি 'চার চিনার'—ভেরি ফাইন।"

শুভ্রা বলল, "পিসি তুমি হায়দ্রাবাদ দেখেছ নাকি?"

মৃণালবাবু বললেন, "বৌদি দক্ষিণ ভারতের কিছু আর বাদ রাখেন নি।"

কিছুক্ষণ পরে আমরা আবার শিকারায় চেপে এগিয়ে চললাম। কিছুদূর এসে একটা বিজ্ঞাপন দেখা গেল 'সংরক্ষিত অঞ্চল'। স্বপ্না বলল, "দ্বীপের মধ্যে কি সুন্দর বাংলোটি, দূর থেকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"

শুভ্রা বলল, "আর উদ্যানটি কেমন সুদৃশ্য ভাবে সাজান।"

বৌদি বললেন, "দ্বীপের চার পাশ ঘিরে পদ্মগুলি থাকায় আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।"

গোধূলির রক্তিম আলোকে ভাসমান উদ্যানের ধারে ধারে অপূর্ব পুলকে আমরা ভেসে চলেছি। পদ্মের লোভে শুভ্রা ও স্বপ্না বারে বারে মৃণাল ধরে অযথা টানাটানি করছে। শিকারার গতি রুদ্ধ হয়ে হঠাৎ দিক পরিবর্তন করে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাড়া খেয়ে বন্য হংসীর দল চীৎকার করে অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল টুক্ করে।

বৌদি বিরক্ত হয়ে বললেন, "কি হচ্ছে শুভ্রা, শেষকালে কি ডুবিয়ে মারবি নাকি আমাদের সকলকে!" ওরা সকলে হেসে উঠল। বৌদি এবার একটু শান্ত হয়ে আমাকে বললেন, "রাত হয়ে গেল ঠাকুরপো, এবার ফিরে চলুন।"

আমি বসিরকে ইঙ্গিত করতেই সেলিম শিকারা ঘুরিয়ে নিল।

ফেরবার পথে মৃণালবাবু হঠাৎ কাশ্মীরী বালক-বালিকার একটি শিকারা ধরে তাদের গান করতে অনুরোধ করল। তারা হাসিমুখে তাদের শিকারা আমাদের শিকারার সাথে ভিড়িয়ে, কাঠ বাজিয়ে পরপর দু'খানি পল্লীগীতি শুনিয়ে দিল।

খুশী হয়ে বৌদি তাদের দু'জনকে চার আনা পয়সা দিলেন। তারা হাসিতে উপচে পড়ে বার বার আমাদের সেলাম দিতে দিতে চলে গেল।

শুভ্রা বলল, "মিষ্টি সুর ছাড়া গানের এক বর্ণও বোঝা গেল না।"

অমু বলল, "একে কাশ্মীরীভাষা, তার উপর পল্লীগীতি, বোঝা সম্ভব নয়।"

স্বপ্না বলল, "বৈদ্যুতিক আলোকে শঙ্করাচারিয়া মন্দিরটি অপরূপ হয়ে উঠেছে।"

বৌদি বললেন, "আজকের এই চাঁদনী রাত আর ডালের দৃশ্য, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যেন তারকার মত জ্বলতে থাকবে। প্রতি বছর এই মহানবমী তিথিতে আমাদের মনে সঙ্গীদের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেবে বারবার।"

স্বপ্না বলল, "সত্যি আজকের এই চাঁদনী রাতে ডাল যেন অপরূপ হয়ে উঠেছে।"

শারদীয়া শুক্লা নবমীর চন্দ্রিমা তার শুভ্র জ্যোৎস্নায় ত্রিভুবন ভরিয়ে দিয়েছে। মাঝিদের বৈঠার তালে তালে অদূরে কাশ্মীরী লোক-সঙ্গীতের মোহময় মূর্ছনায় ডাল যেন স্বপ্ন রাজ্য সৃষ্টি করে রয়েছে। আমরা এক অব্যক্ত আনন্দে সুধাংশু কিরণে অবগাহন করে ডালবক্ষে ভেসে চলেছি। মনে হচ্ছে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের স্বর্গ রাজ্য আজ ডালবক্ষে নেমে এসেছে।

বৌদি ও শুভ্রার বিশেষ অনুরোধে দশমীর বিকালে পুনরায় সকলে ডালে এসে শিকারায় চাপলাম। সেলিম ও বসিরের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তারা বৈঠা জলে ফেলে বাইতে সুরু করল।

মৃণালবাবুর মুখে রোদ পড়ায় শুভ্রা ঠাট্টার সুরে বলল, "আ-হা-হা বেচারীর মুখখানা যে রোদে পুড়তে লাগল। অমু তুই তো ওদিকটায় গিয়ে বসতে পারতিস।"

মৃণালবাবু ক্ষেপে উঠে বললেন, "আহা রে, যেন আমার ঠাকুমা এলেন দরদ নিয়ে।"

শুভ্রা হেসে বলল, "মন্দ কি, মেয়েরা তো মা হয়েই জন্মায়। না হয় প্রমোশন পেয়ে আরও একধাপ এগিয়ে গেলাম। তবু তো একটু নূতনত্ব আছে।"

আমরা বসিরকে ডালের শেষ প্রান্ত দিয়ে চক্কর দিতে বলেছি। শিকারা 'চার চিনার' ও ভাসমান উদ্যান ছেড়ে বহুদূর চলে এসেছে। এবার একটি সেতুর নীচে দিয়ে শিকারাটি অন্য দিকে চলে এল।

শুভ্রা বলল, "ডালের মধ্যে দ্বীপ থেকে দ্বীপে যাওয়ার জন্য আবার সেতু, এ তো আমরা ভাবতেই পারি নি।"

বৌদি বললেন, "ডাল কি একটি ছোটখাটো জলাশয় ভেবেছিস্ নাকি, কত বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে ডালের পরিস্থিতি।"

এই নির্জন অঞ্চল দিয়ে এক কাশ্মীরীবালা আনমনে শিকারা চালিয়ে চলেছে। হঠাৎ আমাদের সাথে দৃষ্টি বিনিময় হতেই এক টুকরো মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে গন্তব্য পথে অদৃশ্য হল।

স্বপ্না বলল, "এদেশে মেয়েদের মুখে সর্বদাই মিষ্টি হাসি উপচে পড়ছে। সারা কাশ্মীরে এর আর ব্যতিক্রম নেই।"

মৃণালবাবু বললেন, "বৌদি আপনারা এর ছোঁয়াচ নিয়ে গিয়ে বাংলার মেয়েদের গায়ে মাখিয়ে দেবেন।"

রূপেন বলল, "ঠিক বলেছেন মৃণালবাবু, তাহলে বাঙ্গালীকে আর পয়সা খরচ করে কাশ্মীরে আসতে হবে না।"

স্বপ্না বলল, "আহা, বাঙ্গালী মেয়েরা বুঝি হাসতে জানে না। সে বরং তোমরা পুরুষ মানুষ, কিছু হলেই ব্যস্, মুখ একেবারে গম্ভীর।"

শুভ্রা বলল, "পিসেমশায়কে খুব একচোট নিয়েছে পিসি।" আমরা সকলে হাসতে লাগলাম।

সূর্য অনেকক্ষণ অস্ত গেছে। শরতের সুনির্মল আকাশ থেকে জ্যোৎস্নার ঢল নেমে স্বচ্ছ জলে দোলা খাচ্চে। আমি বললাম, "মৃণালবাবু একখানা গান ধরুন।"

"দাদা কোরাস গান যদি বলেন তাহলে একখানা গাইতে পারি, তবে সকলকে আমাকে সাহায্য করতে হবে।"

"মন্দ কি কোরাস গানই একখানা গান।"

স্বপ্না বলল, "ঠাকুরপো আপনি গান সুরু করলে আমাদের দিক থেকে সহযোগিতার ত্রুটি হবে না।"

মৃণালবাবু সুরু করলেন, "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা—আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা। সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।"

আমরা সকলে গাইতে সুরু করলাম। বৌদিও বাদ গেলেন না। গান শেষ হয়ে গেল। সকলে মৃণালবাবুর সুখ্যাতি করলেন।

বৌদি বললেন, "শুভ্রা তুই এবার একটা গা।"

শুভ্রা 'ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়' ও 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে' পর পর দু'খানি রবীন্দ্রসঙ্গীত মন প্রাণ ঢেলে সুমিষ্ট কণ্ঠে গেয়ে নির্জন ডালবক্ষে সুরের মূর্ছনায় সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

আমি মুগ্ধ হয়ে বললাম, "অপূর্ব সুন্দর। এত সুন্দর গান গাইতে জান সে কথা তো তুমি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করনি?"

বৌদি বললেন, "ওর মিষ্টি গলা দেখে উনি ছেলেবেলা থেকেই ওর জন্যে ঘরে মাষ্টার নিযুক্ত করেন। তারপর কলকাতার কলেজে পড়ার সময় ও বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা করে নাম করে।"

বৌদি আরো বললেন, "মহাত্মা গান্ধী আমাদের বাড়িতে এলে শুভ্রাই তাঁর প্রার্থনা সভায় সকাল ও সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে তাঁকে খুশী করত। আমরাও বাড়ির সকলে মহাত্মাজীর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে রামধুন সঙ্গীতে যোগ দিতাম। সবই এখন স্বপ্ন বলে মনে হয়।"

ডালে প্রায় দশ মাইল চক্কর দিয়ে রাত ন'টার সময় আমরা হোটেলে ফিরলাম। দেখি বিজয়ার উৎসব চলেছে।

রূপেন বলল, "বাঙ্গালীর একটা বৈশিষ্ট্য—পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন বিজয়ার উৎসব পালন করবে।"

স্বপ্না বলল, "শুধু বিজয়ার উৎসবই নয়, দুর্গা ও সরস্বতী পূজাও বাংলার বাইরে জাঁকিয়ে করে।"

মিঃ ঘোষ দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এসে বললেন, "সন্ধ্যা থেকে মিঃ চাটার্জি ও আপনার পার্টির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছি। আপনাদের অভাবে আমাদের বিজয়া সম্মিলনী ঠিক এতক্ষণ জমাটি হচ্ছিল না।"

আমরা হাসতে হাসতে তাঁর সঙ্গে হলে এসে বসলাম। নৃত্য ও

গীতের ঝংকারে দর্শকবৃন্দ স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে বসে আছেন। আমাদের উপস্থিতি কেউ জানতে পারলেন না।

আমি মিঃ ঘোষের কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন কে গাইছে?"

মিঃ ঘোষ নীচু গলায় বললেন, "কলকাতা থেকে আগত রেডিও আর্টিষ্ট, মিস্ বেলা দে।"

সুমিষ্ট গলায় মীরার ভজন চলেছে 'ফাগুন কী ঋতু আঈ আলী, কোয়েল গায়ে রচা, পিয়া গয়ে পরদেশ সখী, ম্যয় কা সঙ্গ খেলু ফাগ্?'

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

একাদশীর দিন হুপুরে বিশ্রামের জন্য বিছানায় উঠলে স্বপ্নার কথা কানে এল, "দেখ এ রকম করলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হল আবার তোমাদের।"

"দেখুন না দাদা?" কথাটি বলতে বলতে স্বপ্না এসে আমার খাটে বসল। রূপেনও এসে কুশানে বসল।

আমি বললাম, "কি ব্যাপার?"

স্বপ্না বলল, "উনি বলছেন কতদিন ডালে বেড়ান হল কিন্তু এ পর্যন্ত তার সম্বন্ধে কিছু লেখা হয় নি। তাই আজ বেড়াতে না গিয়ে সন্ধ্যায় নিরিবিলিতে বসে লিখবেন।"

আমি বললাম, "ভালই তো, তুমিও আজ আর কোথাও যেও না, আমি বরং আজ একলা একটু ঘুরে আসি।"

"আহা, দাদার যেমন কথা—আমি কি অপরাধ করলাম! বেড়াতে যদি না যাব—তবে কাশ্মীরে এলাম কি জন্য। তাছাড়া আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন যেখানেই যাবেন আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন, সে কথা ভুললে এখন চলবে না।"

রূপেন বলল, "সেই ভাল স্বপ্না, তুমি দাদার সঙ্গে আজ ঘুরে এস।"

আমি বললাম, "সেটা সম্ভব নয়, কারণ আমার প্রোগ্রাম রাত্রি বেলায়। ভাবছি আজ গভীর রাতে ডালে একটি চক্কর দেব।"

স্বপ্না বলল, "সুন্দর প্ল্যান। আমি এ সুযোগ ছাড়তে রাজী নই।"

রূপেন বলল, "শুধু সুন্দর নয় স্বপ্না, রাতে ডালের একটা পৃথক রূপ আছে। দাদা আমিও আপনাদের সঙ্গী হতে চাই।"

রূপেনের দিকে চেয়ে স্বপ্না বলল, "পথে এস এবার।"

আমি বললাম, "বেশ তোমরা তৈরী থেকো। ডাকা মাত্র আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে। তবে দেখো কথাটি যেন জানাজানি না হয়। আর একটা কথা স্বপ্না, পুরুষ বেশে তোমাকে প্যাণ্ট পরে বেরুতে হবে।"

স্বপ্না হেসে বলল, "তাতে আমার আপত্তি নেই, তবে চুল-গুলো নিয়ে হয়েছে ফ্যাসাদ।"

রূপেন বলল, "সে ভাবনা আমার। আমার ফেল্ট হ্যাট্ পরলে সব কভার করে যাবে।"

রাত বারোটা বাজবার আগেই ঘরে টোকা দিলাম। ওরা তৈরী ছিল। রূপেন দরজা খুলে বেরিয়ে এল। পিছনে স্বপ্না। আমি বললাম, "সঙ্গে একটি করে কম্বল নাও।"

স্বপ্না বলল, "এই ওভার কোটের উপর ?"

"হ্যাঁ, বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা।"

ওরা কম্বল নিয়ে আমার পেছনে আসতে লাগল। মোটা বকশিশের লোভে জমাদার গেট খুলে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা গেটে আসতেই বলল, "সাহেব রাত তিনটে পর্যন্ত আমি আপনাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করব।"

আমি বললাম, "তার আগেই আমরা ফিরে আসব।"

রাস্তা পার হয়ে আমরা শিকারায় উঠলাম। দোলা খেয়ে বসির জেগে সেলাম দিল। আমরা ভিতরে এসে কম্বল জড়িয়ে বসলাম।

স্বপ্না বলল, "সেলিম, ভাল করে পর্দাগুলো ঢেকে দে বাবা।"

ওরা অবাক হয়ে এক সঙ্গে বলল, "বেগম সাহেব আপনি ?"

"কেন তোরা আমাকে চিনতে পারিস নি বুঝি ?"

বসির বলল, "আপ বিলকুল মেমসাব্ বেনে গেছেন যে!"

সেলিম বলল, "বাত্ শুনে এখন মালুম হল।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে, এখন যা দেখাবার কথা সেখানে আমাদের নিয়ে চল্। আর ফেরবার পথে যে সব জায়গায় গান হচ্ছে সেখানে একটু ঘুরিয়ে আনবি।"

ওরা শিকারা ছেড়ে তর্ তর্ শব্দে নেহেরু পার্কের দিকে এগিয়ে চলল।

রাত দুটোর সময় আমরা কাঁপতে কাঁপতে শিকারা থেকে নামলাম। গেটে আসতেই জমাদার গেট খুলে দিল। তার হাতে একখানা দশটাকার নোট দিলাম। সে হাসি মুখে সেলাম দিয়ে বলল, "সাহেব চা খাবেন?"

"রূপেন বলল, "এইরাত্রে চা পাওয়া যাবে?"

জমাদার বলল, "জী আমি বয়কে আগে থেকেই বলে রেখেছি।"

স্বপ্না বলল, "তাহলে একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

আমি ঘরের তালা খুলতেই রূপেন বাতি জ্বালিয়ে হিটার চালিয়ে দিল।

স্বপ্না ওভার কোট খুলতে খুলতে বলল, "আর একটু হলেই আজ ফাঁকে পড়েছিলাম আর কি। আর দাদার সঙ্গে না গেলে ডালের স্বরূপ চিনতে পারতাম না। এখন বুঝতে পারছি পুরুষরা ডাল ও হাউসবোটের নামে কেন এত পাগল হয়।"

রূপেন আমার দিকে অর্থপূর্ণভাবে চাইল। দরজায় টোকা দিয়ে 'বয়' চা-এর ট্রে এনে টেবিলের উপর রাখল।

স্বপ্না তাড়াতাড়ি তার ব্যাগ থেকে দুটাকার একটা নোট বয়কে দিল।

বয় হাসিমুখে সেলাম দিয়ে চলে গেল। স্বপ্না বলল, "এখানকার লোকেরা সার্ভিস দিতে জানে।"

রূপেন বলল, "সত্যি, এই রাতে কিছু বকশিশ পাবার জন্যে বসে আছে চা নিয়ে।"

স্বপ্না চা ঢেলে আমাদের সামনে রাখল। রূপেন বার দুই কাপে চুমুক দিয়ে বলল, "এবার যেন ধড়ে প্রাণ এল।"

স্বপ্না বলল, "চা-টা হ'য়েছেও ভাল, খেতে ভারি আরাম লাগছে।"

দুকাপ করে চা খেয়ে ওরা কুশান ছেড়ে উঠল।

আমি রূপেনকে লক্ষ্য করে বললাম, "আজ রাতের অন্ধকারে আমরা যা দেখে এলাম, কাল দিনের আলোতে তার নিখুঁত বর্ণনা যেন তোমার খাতায় দেখতে পাই।"

স্বপ্না হাসিমুখে রূপেনকে একটু ঠেলা দিয়ে তাদের ঘরে চলে গেল। আমি পোষাক ছেড়ে শুয়ে পড়লাম।

দ্বাদশীর দিনে খাওয়া সেরে ঘুমানোর জন্য বিছানায় উঠলাম। স্বপ্না ও রূপেন এসে আমার খাটের উপর বসল। রূপেনের হাত থেকে খাতাখানি নিয়ে আমি স্বপ্নার হাতে দিলাম। স্বপ্না পড়তে সুরু করলো,

'ডালে' নিশীথ অভিযান

"ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলেও ডালের বয়স অনুমান করা শক্ত। সে যেন একজন 'চিত্রতারকা'—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাকে ভালবাসে। সেও সকলকে সঙ্গ দেয় সমান ভাবে। পক্ষপাতহীন ব্যবহার তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তার মিষ্ট মধুর স্বভাব, সৌন্দর্য প্রীতি, নৃত্য, গীত ও ছন্দে ভরা সলজ্জ ভঙ্গিমা দেখলে তাকে ষোড়শী তন্বী বলেই মনে হয়।

"সন্ধ্যার অভিসারমুখী ডালকে কিন্তু সকালে চেনা যায় না। তখন তার বেশভূষার ও আকৃতির পরিবর্তন হয়। মাত্র কিছুক্ষণের জন্য। এ সময় তার স্বভাবেরও ব্যতিক্রম দেখা যায়। সারা রাত্রির পরিশ্রান্তে ক্লান্তি নেমে আসে তার চোখে। মনে হয় সে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আবেশে। বিদেশী কোন আগন্তুক এ সময় তার কাছে এলে হতাশ হয়ে ফিরে যাবে।

"প্রতিদিন সে কুমারী থেকে সুরু করে বৃদ্ধার ভূমিকা পর্যন্ত প্রখ্যাত অভিনেত্রীর ন্যায় সুষ্ঠুভাবে অভিনয় করে সকলকে অভিভূত করে দেয় মুগ্ধ বিস্ময়ে।

"শ্রীনগরে এসে ডালকে উপেক্ষা করা যায় না। তার আকর্ষণের মোহ আগন্তুকদের প্রতিদিন উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। বিদেশী পর্যটকদের দল অহোরাত্র তার বক্ষে অতিবাহিত করে স্বর্গ সুধা পান করেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁরা নিজেকে এখানে হারিয়ে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়েই ফিরে যান। তার অঙ্গের সুষমামণ্ডিত ও সৌন্দর্য-প্রিয় স্থানগুলি সকলকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে নিয়ত।

"সকাল আটটা থেকেই তার বক্ষে প্রমোদ তরীগুলির চলাচল সুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গেই শিকারায় কাশ্মীরী ভাই-বোনেরা ফল ফুল ও নানান পণ্য সম্ভার সাজিয়ে ক্রেতার সন্ধানে ধাবিত হয়। প্রমোদ তরীগুলির সান্নিধ্যে এসে লোলুপ দৃষ্টি হেনে আরোহীর মনযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে। দৃষ্টি বিনিময়ের সাথে মিষ্টি হেসে মধুর সম্ভাষণে বলে, "খানদানি চীজ আছে মুশয়, বহুত্‌ সস্তা দরে নিয়ে যান।"

"অপরাহ্নের পর ডালে উৎসবের জোয়ার সুরু হয়, ক্রমশঃ সেটা বাড়তে বাড়তে সন্ধ্যার পর পূর্ণ জোয়ারের বন্যায় সকলকে প্লাবিত করে। তখন সে নন্দন কাননে স্বর্গীয় দ্যুতি ও সৌরভ ভরা

মায়ার কাননে ঘেরা এক স্বপ্ন রাজ্য। নৃত্য গীতে সুরের মোহময় মূর্ছনায় দর্শকবৃন্দকে আবিষ্ট করে দেয়। তার সৌন্দর্য তখন শত উর্বশী ও মেনকাকে ম্লান করে দেয়। রাত বারোটার পর তার সৌন্দর্যে ভাঁটা পড়তে শুরু করে।

"এই স্বর্গ রাজ্য ছেড়ে হু'য়েক দিনের মধ্যেই আমাদের চলে যেতে হবে। জানি যাবার সময় ডালকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে। তবুও তার আকর্ষণ শত চেষ্টায় এড়াতে পরিনে। তাই তো আজ গভীর রাত্রে ডালের নগ্ন-সৌন্দর্য দেখার জন্য জোর করে আমি ও স্বপ্না দাদার সাথী হ'লাম।

"রাত বারোটায় ডালে এসে শিকারায় উঠতেই বসিরের তন্দ্রাভাব কেটে গেল। আমরা ভিতরে কম্বল জড়িয়ে বসতেই সেলিম ও বসির হাসিমুখে বৈটা উঠিয়ে বাইতে সুরু করল। শিকারা 'নেহেরু পার্কের' দিকে শন্ শন্ শব্দে এগিয়ে চলল।

"নেহেরু পার্কের বিশ্রামাগারের বৈদ্যুতিক আলোকের রশ্মি ডালে বিচ্ছুরিত হ'য়েছে। মনে হচ্ছে ডাল যেন মস্তকে একটি স্বর্ণমুকুট ধারণ করেছে। তীরে শ্রেণীবদ্ধ নীল বৈদ্যুতিক আলোকগুলি ডাল বক্ষে পড়ে ঠিক মহামূল্য নীলার নেকলেসের মতই শোভা পাচ্ছে। জ্যোৎস্না চার চিনার ভেদ করে ডাল অঙ্গে পড়ে ঠিক কেশাবদ্ধ শুভ্র রজনীগন্ধার পুষ্পস্তবক বলে মনে হচ্ছে। শরতের সুনির্মল নীলাকাশে শুক্লা একাদশীর সুধাংশু কিরণে ডালকে স্বর্গীয় সুষমায় স্নান করিয়ে দিচ্ছে।

"নেহেরু পার্ককে পশ্চাতে রেখে আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে ডালে সংরক্ষিত ভাসমান বাগিচায় প্রস্ফুটিত কমল ও কণ্টকিত মৃণালের বাহুলতা ছিন্ন করে একটি সুদৃশ্য উদ্যানে প্রবেশ করে আরামদায়ক স্থানে উপবেশন করলাম।

"এক সময় এ উদ্যানটি মহারাজার নিজস্ব বিলাসের জন্য নির্দিষ্ট

ছিল, অধুনা প্রধানমন্ত্রী কিংবা বিদেশী রাজকীয় অভ্যাগতদের চিত্ত-বিনোদনের রমণীয় স্থান হিসাবে সুরক্ষিত।

"উদ্যানে সুরম্য বাংলোটি মধ্যমণি হয়ে বহুমূল্য আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। তার চারিদিক গোলাপ ও মৌসুমী পুষ্পলতা সুরুচি-পূর্ণভাবে অবস্থিত। উদ্যানটির বহির্দেশের চারধার দুই বর্গ মাইল সুগভীর জলে অগণিত পদ্মপুষ্প বিকশিত। বাংলোটি ভিতর দিক থেকে অর্গলবদ্ধ। মনে হয় কোন সশস্ত্র প্রহরী অভ্যন্তরে নিদ্রামগ্ন।

এই স্থান থেকে ধ্যানগম্ভীর 'শঙ্করাচারিয়া' মন্দিরটির দৃশ্য অপূর্ব সুন্দর। অদূরে হরি পর্বত শুভ্র বসনে নিজেকে যেন আবৃত করেছে। সূর্যের আলোক যেখানে প্রবেশ করা কল্পনা প্রসূত ছিল, চন্দ্রের কিরণ সেখানে আসতে পেরে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

"প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে মহীশূর রাজ্যের 'ললিতা প্যালেসে'র কথা, যে প্রাসাদে বিশেষ সম্মানিত অতিথি ক্রুশ্চেফ ও বুলগানিনকে ভারত সরকার নৃত্যগীতে আপ্যায়িত করেছিলেন। গত বিধানসভা ও লোক সভার নির্বাচন উপলক্ষে মহীশূরের মহারাজা বাঙ্গালোরে ছিলেন। সে জন্য আমরা প্রবেশ পত্র সংগ্রহে অপারগ হয়ে শেষ পর্যন্ত রক্ষীদের কিছু বকশিশ দিয়ে কার্য সমাধা করে আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটাই।

"ডিসেম্বরের শেষ থেকেই শ্রীনগরে তুষারপাত সুরু হয়। শুনেছি সত্র একবার তুষার পাতের সঙ্গেই বৃক্ষ লতা গুল্ম প্রভৃতি পত্রশূন্য হয়ে সৌন্দর্যহীন হয়ে পড়ে। জানুয়ারী মাসে ডালের জলরাশি জমাট বেঁধে কঠিন হয়ে যায়। হাউস বোটগুলি সে সময় নিশ্চল হয়ে স্বস্থানে আটকে পড়ে। এ উদ্যান ও ডালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ-গুলি এখন পেঁজা তুলার মত তুষার স্তূপ পড়ে জমে যায়। ডাল সে সময়ও পর্যটকদের সঙ্গ দানে বঞ্চিত করে না। শিকারার পরিবর্তে তখন তার বক্ষে জীপের আনাগোনা সুরু হয়।

"কিন্তু আর আমাদের এক্ষণে এভাবে বসে থাকা সম্ভব হল না। ভীষণ কন্‌কনে ঠাণ্ডায় হাত পা অবসন্ন হয়ে তীব্র শীতে কম্প সুরু হল। দাদা চারিদিকে বার বার দৃষ্টিপাত করে বললেন—অপূর্ব এ দৃশ্য। ভারতের বহুস্থানেই তো ঘুরেছি, কিন্তু কাশ্মীরে ডালের এ দৃশ্যের আর জোড়া নেই। স্বপ্না আবেশ মাখান চোখে বলল, 'ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। কোন হাউস বোট পেলে আরও কিছুক্ষণ উপভোগ করা যেত।'

"মাত্র দশ মিনিট উদ্যানে অবস্থান করে আমরা শিকারায় উঠতে বাধ্য হলাম। সেলিম ও বসির হাসিমুখে শিকারার দিক পরিবর্তন করে উৎসব রত হাউস বোটগুলির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

"সুন্দর হাউস বোটগুলি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে পাশাপাশি অবস্থিত। প্রত্যেকটির নামের সামনে উজ্জ্বল আলোক মালা প্রজ্জ্বলিত থেকে তাদের পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। কোন কোন বোটের অভ্যন্তরে আলোক নির্বাপিত হয়েছে। মধ্যে মধ্যে গানের সুর ও হাসির ঝঙ্কার বাতাসে ভর করে ভেসে এসে ডালের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কদাচিৎ যাত্রী বিহীন দু' একটি শিকারা উৎসব অন্তে গৃহে ফিরে চলেছে।

"একটি বিশেষ শ্রেণীর হাউস বোটের কাছে এলে আলোক রশ্মির সাথে সঙ্গীতের সুর কানে এল।

"আরও কয়েকটি হাউস বোট অতিক্রম করে আর একটি বিশেষ শ্রেণীর হাউস বোটের পাশে এসে আমাদের শিকারা একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল। গত দু' দিন ধরে এই হাউস বোটে বোম্বাই-এর প্রখ্যাত চিত্রতারকাদ্বয় সুটিং-এ এসে অবস্থান করছেন। মীড়, গমক ও মূর্ছনায় অপূর্ব সঙ্গীতের ঝঙ্কারে স্থানটি একেবারে জমাট বেঁধে গেছে। কড়ি থেকে কোমলে তান দ্রুতলয়ে তবলার সঙ্গে সঙ্গত চলেছে। আরও কিছুক্ষণ এ ভাবে ঘুরে রাত্রি দুটোর সময় আমরা হোটেলে ফিরলাম।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

"ঠক্ ঠক্ ঠক্"—দরজায় টোকা পড়ল। আমরা তৈরি ছিলাম। রূপেন দরজা খুলে দিল। মোতি চা দিয়ে যেতেই অন্য লোক এসে আমাদের বিছানা স্যুটকেস্ প্রভৃতি উঠিয়ে নিয়ে গেল। অল্পক্ষণ পরে ঘন ঘন বাসের হর্ণ বেজে উঠতেই রূপেন বলল, "চলুন দাদা।"

স্বপ্না শঙ্করাচারিয়ার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে আমাদের সঙ্গে এসে বাসে উঠল। যাত্রীরা সকলে সীটে বসলে হর্ণ দিয়ে বাস ছেড়ে দিল।

এখানে ফেলে আসা দিনগুলি একে একে মনের দরজায় এসে উঁকি দিতে সুরু করল। ডাল, ঝিলাম, উলার, গুলমার্গ, পাহলগাঁও ও আরও অনেকে। 'ক্ষীর ভবানী'র কাশ্মীরী বোনের কথাও জেগে উঠে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

মনে হল যাবার সময় সকলেই যেন হাতছানি দিয়ে পিছু ডেকে বলছে, "আমাদের কাছে আরও কিছু দিন থেকে যাও।" কিন্তু আমার একস্থানে বসে থাকবার সময় কৈ! জীবন অপরাহ্নে জানি না কোন্ আকর্ষণে হঠাৎ এখানে এসে কদিনের জন্য অতিথি হয়ে গেলাম।

স্বপ্না বলল, "দাদা অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছে না। শুভ্রাদের কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি নে কেন?"

"শশীবাবুরা পিছনের বাসে জায়গা পেয়েছেন," আমি বলি।

"আর ঠাকুরপো?" স্বপ্না জানতে চায়।

আমি উত্তর করি, "মৃণালবাবুও ওঁদের বাসে আছেন।"

হঠাৎ বাসটি থেমে গেল। দেখি টুরিষ্ট অফিসের সামনে এসে অন্য গাড়ির পিছনে লাইনে দাঁড়িয়েছে।

মিঃ ঘোষ বললেন, "আবার এখানে এলে কেন?"

মিঃ দাস বললেন, "টুরিষ্ট অফিসে যাত্রীদের স্টক টেকিং হয় যে।" যাত্রীরা সকলে হেসে উঠলেন।

মিঃ ঘোষ বললেন, "মিঃ চ্যাটার্জি তো টুরিষ্ট আপিসে একাধিকবার এসে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এ বিষয়ে আমাদের একটু আলোকপাত করুন। কৈ আসবার সময় তো আমাদের কোন ছাড়পত্র নিতে হয় নি?"

আমি বললাম, "ছাড়পত্রের প্রথা কাশ্মীর সরকার প্রত্যাহার করেছেন সত্য, কিন্তু এখানে এঁরা যাত্রীদের আসা যাওয়ার দৈনিক একটা হিসাব রাখেন। এখানে বাস সার্ভিসের প্রধান কার্যালয়। তাছাড়া পোষ্ট আপিস, বুকষ্টল, রসায়নের পারমিট, হাউসবোট বা হোটেলের ব্যবস্থা এখান থেকে হয়। পর্যটকদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধার জন্য টুরিষ্ট আপিসে এলে সাহায্য পাওয়া যায়।"

মি: ঘোষ বললেন, "রাইট ইউ আর, আমি প্রতি বড় রাস্তার মোড়ে কাশ্মীর সরকারের বিরাট বোর্ড দেখেছি। তাতে তাঁরা অভ্যাগতদের টুরিষ্ট আপিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য অনুরোধে করেছেন।"

বাস রেসিডেন্সি রোড ধরে 'বানিহালে'র দিকে এগিয়ে চলল। সূর্য ওঠার পূর্বে আমরা জওহর টানেলের মধ্যে দিয়ে বানিহালে পৌছে প্রাতরাশ করলাম। তারপর আবার বাসে চেপে কুঁদে পৌছুতে এগারটা বেজে গেল। মধ্যাহ্নে ডাক বাংলোতে জলযোগ সেরে কিছু বিশ্রাম নিয়ে আবার বাসে উঠলাম। উধমপুর ও জাজর পার হয়ে জম্মুর ডাক বাংলোতে পৌছুতে বিকেল উত্তীর্ণ হয়ে গেল। ডাক

বাংলোর তিনতলায় পাশাপাশি ঘরে আমরা রাত্রি বাসের জন্য আশ্রয় পেলাম।

স্বপ্না স্নান ঘর থেকে উৎফুল্ল হয়ে বেরিয়ে এসে বলল, "দাদা আপনারাও স্নান সেরে নিন, ক্লান্তি দূর হয়ে আরাম পাবেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "শুভ্রাদের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে স্বপ্না ?"

"হ্যাঁ, বৌদি ও শুভ্রা তো পাশের বাথরুমে গা ধুচ্ছেন।"

আমি ও রূপেন স্নান সেরে পোষাক পরে চা হাতে পেয়ে কাপে চুমুক দিচ্ছি। শুভ্রা হাসিখুশি ভাবে এসে বলল, "কাকাবাবু আমরা তৈরী, মা আপনাদের ডাকছেন—আমাদের রঘুনাথ মন্দিরে নিয়ে যাবার জন্য।"

"শশীবাবু কোথায় ?"

"তিনি ঐখানেই আছেন। আপনারা গেলে সকলে মিলে একসঙ্গে বেরুবেন।"

স্বপ্না বলল, "আমরাও বেড়াতে যাবার জন্য তৈরী হয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি।"

সেই সময়ে বৌদি এসে বললেন, "কৈ কতদূর আপনাদের ?"

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, "চলুন আমরা তৈরী।"

সকলে নীচে নেমে বাংলোর অদূরে জম্মুর প্রসিদ্ধ দেবতা রঘুনাথজীর মন্দিরে এলাম।

বৌদি বললেন, "কত বিস্তীর্ণ এর প্রাঙ্গণ ?"

শুভ্রা বলল, "শুধু তাই নয় মা, মন্দির সীমানার চারদিকে চেয়ে দেখ কত উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।"

আমরা পর পর দুটি তোরণদ্বার পার হয়ে মূল মন্দিরের সামনে এসে রঘুনাথজীকে ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। অমু বলল, "মা, এখানে কি কি মূর্তি আছে বল তো ?"

বৌদি হেসে বললেন, "সামনে রঘুনাথজী, বাঁয়ে জানকীদেবী ও ডাইনে লক্ষ্মণজী।"

শুভ্রা বলল, "মা মূর্তিগুলি যেন জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে।"

স্বপ্না বলল, "সত্যি ভারি সুন্দর।"

অমু বলল, "মা এদিকে এসে দেখ, কত সুন্দর সুন্দর মূর্তি রয়েছে।"

আমরা মন্দির সংলগ্ন পৃথক পৃথক মন্দিরে 'দশ অবতারে'র মূর্তি দেখলাম। স্বপ্না বলল, "বৌদি একটু লক্ষ্য করে মূর্তিগুলি দেখুন, প্রত্যেকের অবয়ব ও ভাবভঙ্গীতে হুবহু কাশ্মীরী সাদৃশ্য রয়েছে।"

বৌদি বললেন, "মূর্তি তৈরীর সময় স্থানীয় ভাবধারা কিছুটা আসবেই।" মন্দিরের লাগোয়া অন্য কক্ষে রক্ষিত লক্ষ শালগ্রাম শীলা দেখে তিনি বললেন, "একসঙ্গে লাখ নারায়ণ শীলা আমাদের কল্পনায়ও কোনদিন আসে নি।"

স্বপ্না বলল, "মন্দিরের দেশ দাক্ষিণাত্যের বহুস্থানেই তো গিয়েছি, কিন্তু একলাখ নারায়ণ কোথাও দেখিনি।"

শশীবাবু পাশের মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ দেখিয়ে আমাকে বললেন, "মিঃ চ্যাটার্জি এদিকে দেখুন।"

আমি বললাম, "সত্যই ভারি সুন্দর।"

রঘুনাথজীর মন্দিরের বিপরীত দিকে দু'টি মূর্তি দেখিয়ে অমু প্রশ্ন করল, "মা ও দু'টি কার মূর্তি?"

বৌদি বললেন, "একটি তো মহাবীরের, দূর থেকেই চেনা যায়, অপরটির নীচে কি লেখা আছে পড়ে দেখ।"

শুভ্রা তাড়াতাড়ি মূর্তির কাছে গিয়ে পড়ে বলল, "মা এটি এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রণবীর সিংহের।"

আমি বললাম, "বৌদি আরতির তো এখনও দেরী আছে, চলুন না এই ফাঁকে শহরটায় একটি চক্কর দিয়ে আসি।"

"আমরা আর যাব না ভাই, শুভ্রা ও অমুকে নিয়ে আপনারা ঘুরে আসুন। আমরা বরং মহাদেব মন্দিরটি দেখে আসি।"

শুভ্রা বলল, "শহর ঘুরে আমরা সোজা বাংলোতে ফিরে যাব মা।"

শশীবাবু বললেন, "সেই ভাল, আরতি দেখে আমরাও বাংলোতে ফিরে যাব।"

রাস্তায় এসে রূপেন বলল, "দাদা আপনারা যান—আমি ফিরলাম।"

"সে কি আমাদের সঙ্গে যাবে না ?"

স্বপ্না বলল, "ওঁকে যেতে দিন দাদা, আজকের লেখাটা বাকি আছে। এখন শেষ করতে না পারলে পরে আর সময় পাবেন না।

চলতে চলতে শুভ্রা বলল, "কাকাবাবু এখানে এসে তখন ভাল করে চা খাওয়া হয়নি। চলুন কোন হোটেলে গিয়ে এক কাপ করে চা খেয়ে নেওয়া যাক।"

অমু বলল, "সামনেই তো 'অশোকা হোটেল' দেখা যাচ্ছে। চল সবাই মিলে ঢুকে পড়ি।"

স্বপ্না বলল, "শহরটা বেশ বড় ও জাঁকজমকপূর্ণ, বহু বড় বড় হোটেল ও দোকান রাস্তার দু'ধারে সাজান আছে।"

অমু বলল, "আর এখানকার ডাক বাংলো কত বড় ? মনে হয় একসঙ্গে হাজার হাজার লোক থাকতে পারে।"

শুভ্রা বলল, "পিসি, খাবার হলটাও খুব বড়। পৃথকভাবে টেবিল চেয়ারে বসেও এক সঙ্গে প্রায় দেড়শো লোক খেতে পারে।"

আমি বললাম, "জম্মুর উপর দিয়েই তো কাশ্মীর যাবার রাস্তা। যাতায়াতের পথে বহুলোককেই এখানে রাত্রি বাস করতে হয়।"

আমরা অশোকা হোটেলে ঢুকে চেয়ারে বসতেই বয় এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল।

আমি ইঙ্গিতে বয়কে বললাম, "আমরা কলকাতায় থাকি। তোমাদের এখানে ভাল চা খেতে এসেছি, আর তার সঙ্গে মেমসাব যা ফরমাস করেন।"

কথাটি বলে আমি ইঙ্গিতে শুভ্রাকে দেখিয়ে দিলাম। বয় শুভ্রার কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

দিতে একটু দেরী করলেও কলকাতা ছাড়ার পর এত সুন্দর চা আর কোথাও খাই নি। পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুকাপ করে চা খেয়ে উঠে পড়লাম।

রাত্রি হয়ে গেছে, বহুক্ষণ ধরেই চারদিকে কাঁসর ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। ক্রমশঃ সেটা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা টাঙ্গায় চ'ড়ে বড় রাস্তার উপর দিয়ে চলেছি। শুভ্রা বলল, "পিসি এখানকার আবহাওয়া আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে পরগৃহ ছেড়ে আজ নিজের বাড়িতে ফিরে এলাম।"

স্বপ্না বলল, "আমরা যে গরম দেশের লোক ভাই, শীতের পর এই রকম বসন্তের ঝিরঝিরে হাওয়া তো ভাল লাগবেই।"

অমু বলল, "দিদি মনে হচ্ছে ঠিক যেন ফাল্গুন মাস পড়েছে।"

শুভ্রা বলল, "কাকাবাবু চেয়ে দেখুন এখানেও কত শালের দোকান রয়েছে।"

আমি বললাম, "যাঁরা জম্মু আসেন তাঁরা এখান থেকে শাল কিনে নিয়ে যান।"

অমু বলল, "দিদি সামনের দিকে দুধারে চেয়ে দেখ কত বড় বড় মিষ্টির দোকান রয়েছে।"

"ও মা তাইতো। সত্যি, কত দিন মিষ্টির মুখ দেখিনি, চল না পিসি, নেমে সকলের জন্য কিছু মিষ্টি কিনে আনি।"

স্বপ্না বলল, "দাদা টাঙ্গাকে দাঁড় করান আমরা নামব।"

টাঙ্গা একটু এগিয়ে দাঁড়াতেই অমু বলল, "আরে ঐ তো মা ও কাকীমা মিষ্টি কিনছেন।"

বৌদি স্বপ্নাকে বললেন, "এখানে আর তোমাদের নামতে হবে না ঠাকুরঝি, আমি পেঁড়া ও রাবড়ি সকলের জন্যই কিনেছি।"

তারপর শুভ্রাকে লক্ষ্য করে বললেন, "আর বেশীদূর যেও না কিন্তু, একদিনে বেশি পরিশ্রম সহ্য হবে না।"

আমরা টাঙ্গাওয়ালাকে চালাতে বললাম। টাঙ্গা এগিয়ে চলল।

শুভ্রা বলল, "জানেন কাকাবাবু মার মনে বড় ভয়—সেই যে কাশ্মীরে এসে প্রথমদিন জ্বরে পড়েছিলাম, মা এখনও সে কথা ভোলেন নি।"

"মা না হওয়া পর্যন্ত কোন মেয়েই মায়ের কথা সঠিক বুঝতে পারে না।"

স্বপ্না বলল, "সত্যিই তাই।"

আমরা বাজারের চারপাশে কয়েকটি বড় রাস্তায় চক্কর দিয়ে ডাক বাংলোতে ফিরে এলাম। তিনতলায় উঠতেই বারান্দায় মিঃ ঘোষ ও মিঃ দাসের সঙ্গে দেখা হল।

মিঃ ঘোষ বললেন, "চলুন মিঃ চ্যাটার্জি, উপরের ছাদে যাই।"

স্বপ্না ও শুভ্রা ঘরে ঢুকল। অমু আমাদের সঙ্গে ছাদে এল। জ্যোৎস্না রাতে শহরটির বহুদূর পর্যন্ত সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে। অদূরে তাওয়াই নদী, জম্মু শহরের গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাসে সমস্ত দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।

মিঃ ঘোষ ধরা গলায় বললেন, "উৎসব অন্তে অদ্যই আমাদের সম্মিলিত শেষ রজনী। মিঃ দাস কাল এতক্ষণ চণ্ডীগড়ের পথে বহুদূর চলে যাবেন। বাকি সকলে অমৃতসর হয়ে দিল্লী। মিঃ চ্যাটার্জি কাল এতক্ষণ কলকাতার পথে চলবেন একাকী।

"আমি বলি আপনি আমার সঙ্গে চলুন। জ্বালামুখী দর্শন করে পরশু সন্ধ্যায় আমরা ডালহাউসি রওনা হব। ওখানে দু-তিন দিন থেকে দিল্লী ফিরে আপনাকে দিল্লী মেলে উঠিয়ে দেব।"

আমি বললাম, "আপনার সঙ্গী হতে পারলে ভালই হত মিঃ ঘোষ, কিন্তু পকেট তো শূন্য হতে চলেছে।"

হাসি মুখে মিঃ ঘোষ বললেন, "পকেটের কথা তো আমি জানতে চাইনি মিঃ চ্যাটার্জি। মিসেস ঘোষ বলেছিলেন আপনার নাকি জ্বালামুখী দর্শনের তীব্র বাসনা আছে,আর ডালহাউসি হবে উপরি পাওনা, কারণ এত দূরের পথ ইচ্ছে করলেই তো সব সময় আসা যাবে না।"

বললাম, "বৌদি ঠিক কথাই বলেছেন। জ্বালামুখী যাবার আমার খুবই আগ্রহ ছিল। কিন্তু কাশ্মীরে যে প্রোগ্রাম ছাড়া বাড়তি দিন থাকা হ'ল। এদিকে ছুটিও শেষ হয়ে এল।"

"অফিসের উপর কারো হাত নেই মিঃ চ্যাটার্জি। আর কর্তব্যের কাছে কোন প্রলভনকেই বড় করে দেখা উচিত নয়। কিন্তু কথা দিন আমরা ফিরে গেলে কোনও এক শনিবারে বর্দ্ধমানে এসে পুনরায় আমাদের সাথে মিলবেন। এখন তো ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন, ঘণ্টা দেড়েকের বেশী সময় নেবে না। ষ্টেশন থেকে মাত্র তিন-চার মিনিটের পথ। কেবল যাবার আগের দিন একটা পোষ্টকার্ড ড্রপ করা।"

"নিশ্চয় যাব মিঃ ঘোষ, আমি কথা দিলাম।"

মিঃ দাস বললেন, "আমি কলকাতায় ফিরে আপনার অফিসে ফোন করে জানাব। আপনি অফিস ফেরতা আমাদের বাড়িতে চা খেয়ে ফটোগুলির বিলি ব্যবস্থা করে দেবেন।"

হেসে বললাম, "ঠিক আছে মিঃ দাস, তাই হবে।"

মিঃ ঘোষ বললেন, "মিঃ চ্যাটার্জি আপনার ভগ্নিপতি মিঃ মুখার্জিকে একবার ডাকুন না। তাঁর লেখা অনেকদিন হ'ল শোনা হয় নি। যদি নূতন কিছু লিখে থাকেন এখন শোনা যেত।"

রূপেন এবং আর সবাইকে ডেকে আনবার জন্যে আমি অমুকে বললাম। অমু চুপচাপ নিচে নেমে গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বৌদি কাছে এসে হাসতে হাসতে বললেন, "কেমন কাকু জ্যোৎস্নায় ছাদে বসে ফুর্ ফুরে হাওয়া খাচ্ছেন ঠাকুরপো, আমাদের তো একবার ডাকতে হয়।"

"অমুকে দিয়ে আমিই তো আপনাদের ডাকতে পাঠালাম।"

"সে তো এখন, আমরা তো বহুক্ষণ থেকেই আপনাকে খুঁজছি।"

"কেন, আমরা তো স্বপ্না ও শুভ্রার সামনে দিয়েই ছাদে উঠলাম।"

স্বপ্না বললে, "আপনারা কোথায় গেলেন আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।"

শুভ্রা বলল, "পিসি এদিকে ফিরে দেখ কি সুন্দর নদী, আবার নৌকাও রয়েছে। চল নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি।"

বৌদি বললেন, "না রাতে আর কোথাও নয়, ডালে দিন রাত শিকারায় চড়েও তোমার আশ্ মেটে নি দেখছি।"

রূপেন খাতাখানি আমার হাতে দিয়ে সকলের সঙ্গে আমাদের পাশে বসল।

আমি মিঃ ঘোষকে খাতাখানি দিলাম। মিঃ ঘোষ হাত বাড়িয়ে খাতাখানি স্বপ্নাকে দিয়ে বললেন, "আপনি পড়ুন স্বপ্নাদেবী, আমরা সকলে মিলে শুনি।"

স্বপ্না মিঃ ঘোষের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসুর সুরে বলল, "আমি?"

"হ্যাঁ স্বপ্নাদেবী আপনি, আপনার মুখ থেকে মিঃ মুখার্জির লিখিত বিবরণী শুনতে পেলে আমরা খুশী হব।"

স্বপ্নার চোখ দিয়ে পলকের জন্য একটা চাপা হাসি খেলে গেল। সে আমার দিকে একবার চেয়ে পড়তে শুরু করল,

"বিদায় ভূস্বর্গ"

"রাত্রি চার ঘটিকার সময় আমাদের বাসগুলি পার্ক হোটেল পরিত্যাগ করে জম্মুর উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল। সম্মুখেই নিবিড় সখ্যতাবদ্ধ ডাল। তার দক্ষিণ পার্শ্বে পার্ক হোটেল থেকে নেহেরু পার্ক পর্যন্ত নীল বাতিগুলি ম্লান হয়ে গেছে। আর বাম পার্শ্বে আলোকগুলি নির্বাপিত। দেখে মনে হল আমাদের বিদায় বেলায় ডাল তার বামচক্ষে অঞ্চল দিয়ে অশ্রু নিবারণের ব্যর্থ প্রয়াস করছে। মনে মনে সজল চোখে বললাম, "বিদায় বন্ধু, শুভরাত্রি। এই মনে হয় তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। জীবনে তোমার সাথে গভীর সখ্যতা—যেন এক স্বপ্ন। তোমার প্রাকৃতিক রূপমাধুর্যে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। তোমার সহিত প্রথম শুভদৃষ্টির ক্ষণিক চকিত দৃষ্টিপাত, আমার শিহরিত তনু তোমার সহিত মিলনাকাঙ্খায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে তখনি। তাইতো প্রতিদিন ঊষা ও সন্ধ্যা সমাগমে শিকারায় চেপে তোমার তরঙ্গায়িত বক্ষে কত ক্রীড়া করেছি—কভু শতদল চয়নের ভাণ করে, কভু মৃণাল তোলার ছল করে, কভু চার চিনারে বিশ্রাম-লাভে, কভু শিকারা চালনার বৈঠা বেয়ে।

"চাঁদনী রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোমার সান্নিধ্য থেকে মর্মর ধ্বনি, কলকল্লোল তান, ছলাৎ ছলাৎ ছন্দে নৃত্য দেখে কত আনন্দই না আকণ্ঠ পান করেছি।

"সুদূর বাংলা থেকে এসে তোমার আন্তরিকতাপূর্ণ মিষ্টি ব্যবহার

আমি চিরকাল আমার হৃদয়ের মণি কোঠায় সযত্নে সঞ্চিত রাখব। বিশেষ ক'রে প্রতি বৎসর মহানবমীর সন্ধ্যা,—তোমার জন্য আমাদের সকলের হৃদয়েই দোলা দেবে। কিন্তু হায় সখি, বান্ধবী ঝিলাম কোথায় ? বিদায় ক্ষণে কই তার সাথে তো সাক্ষাৎ হ'ল না। চঞ্চল ঝিলাম, যার চির স্নেহাঞ্চলাবদ্ধ শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানীর পদ মর্যাদায় ভূষিত হয়ে বিশ্বখ্যাত হ'য়েছে—সে কোথায়।

"বুঝেছি ভীরু মন নিয়ে এখন আর তার আমার সম্মুখে উপস্থিত হবার সাহস হয় নি। অথচ প্রতিদিন সে আমার সঙ্গে কত কৌতুকই না করেছে।

"শিকারায় চেপে তার চঞ্চল বক্ষে বিলাসের সাথে কত গান কত মধুর ভঙ্গিমার দৃশ্যই না উপভোগ করেছি। তাই প্রস্থানের সময় ঝিলামের সাথে সাক্ষাৎ না হওয়ায় মন ব্যাথায় ভরে যায়। অশ্রু ঝরে পড়ে আবেগে।

"কিন্তু উপায় কি। চলার পথের পথিক আমরা। প্রকৃতির তরঙ্গ মালার ভেলায় চড়ে বেদের মত ভেসে বেড়াই নিয়ত। স্রোতের মুখে, কখনও বা ভাঁটার টানে ভেসে যেতে যেতে নোঙ্গর ফেলে ক্ষণিক বিশ্রাম লাভ করি কদাচিৎ।

"জানি বাইরে যারা চঞ্চল ও মুখরা, অন্তরেতে কুসুমের মতই কোমল তারা। তাই বিচ্ছেদের সময় কাছে এসে দেখা না দিয়ে ঝিলাম ত্রয়োদশীর চাঁদকে দিয়ে বিদায় অভিনন্দন পাঠিয়েছে।

"চাঁদ সর্বদা আমাদের সম্মুখে থেকে বাসকে রাস্তা দেখিয়ে এনে রেসিডেন্সি রোডের বাঁকের মুখ থেকে বিদায় নিল। মনে পড়ে দীননাথ পণ্ডিতজীর কথা। বহুকষ্টে দাদাকে তিনি কাশ্মীরী ভাষায় উচ্চারণ আপেলকে "চুঁউউট্", বেদানাকে "তা-ন" প্রভৃতি কয়েকটি কথা শিখিয়ে বলেছিলেন—আমার বাড়িতে আপনাদের সাদর নিমন্ত্রণ করছি—আহার ও সমস্ত দিন বিশ্রামের জন্য।

আমার পুত্র, কন্যা ও স্ত্রীর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব। তাঁরা খুশী হয়ে অসীম ধৈর্য নিয়ে সমস্ত দিন ধরে আপনাদের বহু কাশ্মীরী ভাষা শিখিয়ে দেবেন। কিন্তু সময় অভাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

"আরও মনে পড়ে প্রতিদিন সোনালী রৌদ্রের উষ্ণ পরশে নিদ্রা-ভঙ্গ। সলজ্জ হাসির সাথে কুয়াশার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে পীর পাঞ্জাল পর্বতমালা দর্শন। পাহলগাঁওয়ের নীলগঙ্গার চঞ্চলতা ও তরঙ্গায়িত পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা কাশ্মীরী রাণী—শ্রীনগর।

"বিদায়ের বেদনার মুহূর্তে সবই অভিনব বলে মনে হয়। সূর্যোদয়ের পূর্বে আমরা জওহর সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে বানিহালে এসে জম্বু সীমান্তে প্রবেশ করলাম।

"দিল্লীর সাবদারজঙ্গ বিমানবন্দর থেকে বিমানে পাঞ্জাব প্রদেশের উপর দিয়ে সোজা দুইশত মাইল উত্তরে এলে জম্বুপ্রদেশের পাদদেশ। এইস্থান থেকে দশ সহস্রাধিক ফুট উচ্চে বানিহাল গিরিপথ। কাশ্মীর উপত্যকার প্রবেশদ্বার। সমগ্র কাশ্মীর আশি মাইল দীর্ঘ ও পঁচিশ মাইল প্রস্থ।

'পীর পাঞ্জাল পর্বতশ্রেণী কাশ্মীর উপত্যকাকে ভারতভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বিমান থেকে কাশ্মীরের উত্তর পূর্বাঞ্চলের হিমালয় পর্বতমালার তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি দৃষ্টিগোচর হয়। এই সীমা-রেখার অপর প্রান্তে দৃষ্টির বহির্ভূত অঞ্চলে তীব্বত, চীন ও সোভিয়েৎ তুর্কিস্থানের ভূখণ্ড।

"স্রোতাস্বিনী ঝিলাম কাশ্মীর উপত্যকার পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মন্থর গতিতে পাকিস্থানে প্রবেশ করেছে। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ছ'হাজার ফুট উচ্চে নদ, নদী, হ্রদ, প্রস্রবণ ও গিরি পরিবেষ্টিত অপরূপ সৌন্দর্যময়ী কাশ্মীরী উপত্যকা সমগ্র বিশ্বের নিকট অদ্বিতীয়

চিত্তবিনোদনের উৎকৃষ্টতম স্থান। রাজধানী শ্রীনগর কেন্দ্রে অবস্থিত নয়টি সুদৃশ্য সেতুর দ্বারা ঝিলামের উভয় তীরে প্রসারিত।

"শ্রীনগর প্রাচ্যের ভেনিস আখ্যায় ভূষিত। এই নগরী পাঁচ মাইল দীর্ঘ ও আড়াই মাইল বিস্তৃত সুদৃশ্য ডাল হ্রদের গাত্র সংলগ্ন হয়ে অবস্থিত। পর্যটকদের জন্য সুরম্য হোটেল, সুদৃশ্য হাউস বোট ও দ্রুতগামী শিকারাগুলি আকর্ষণীয়। কাশ্মীরীরা শান্ত ও নম্র স্বভাবের। তাঁরা দুর্দিনের বন্ধু ও অতিথিপরায়ণ। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন শিল্পকলা ও কারুকার্যে তাঁরা অনুপ্রাণিত। কাশ্মীরী রমণীরা অপরূপ সৌন্দর্যময়ী ও কর্মিষ্ঠা। উৎসবের সময় তাঁরা সনাতনী নিয়মে শিথিল করে গভীর নীল ও সবুজ বেশে সুসজ্জিত হ'য়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নৃত্য গীতে ও ছন্দের তালে সুরের মোহময় মূর্ছনায় স্বপ্ন রাজ্যের সৃষ্টি করেন।

"নানান কুটির শিল্পে কাশ্মীরীরা অভিজ্ঞ। কাষ্ঠশিল্প, রৌপ্যশিল্প, সূচীশিল্পজাত পশমের শাল বিশ্বের বিস্ময়ের বস্তু। এঁরা বংশ পরম্পরায় এই গৌরবময় ঐতিহ্য ও কৃষ্টি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য স্থান পর্যটকদের দর্শনীয় হিসাবে অবস্থিত। বসন্তের আগমনের সাথে কাশ্মীরী উপত্যকা নানান মরশুমী পুষ্প লতায় ভূষিত হয়।

"শরতের প্রথমে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কাশ্মীর ফল ও ফুলের সৌরভে আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত করে অপরূপ হয়ে ওঠে।

"পৃথিবীর কবি, শিল্পী, চিত্রকর এমন কি সৈনিক পর্যন্ত এই সুষমা-মণ্ডিত উপত্যকার প্রতি আকৃষ্ট হন তার সৌন্দর্য ও লাবণ্যে।

"কাশ্মীরের অতীত জানতে হলে ইতিহাসের ঝরা পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করতে হয়। জম্বু ও কাশ্মীর উপত্যকা যে ভারতের অঙ্গাঙ্গীভূত ও অবিচ্ছেদ্য এবং কাশ্মীরীরা যে আর্য বংশ সম্ভূত হিন্দু—এর জন্য কোন বিশেষ প্রমাণের প্রয়োজন হয় না, কারণ এটা স্বতঃসিদ্ধ।

"এখন পর্যন্ত এখানকার পথে ঘাটে বহু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে প্রাচীন আর্যদের আকৃতি, বর্ণ ও প্রকৃতির হুবহু মিল দেখা যায়। বহু প্রাচীনকালে সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে বিশ সহস্র ফুট উর্দ্ধে পর্বত শৃঙ্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত 'সতীমা'র নামে কাশ্মীরে একটি হ্রদ ছিল। এই হ্রদটি কাশ্যপমুনি কর্তৃক সৃষ্টি হয়। মুনির দেহ রক্ষার পর কাশ্যপমুনির নাম অনুসারে স্থানটি কাশ্মীর নামে খ্যাত হয়।

"বৈদিক যুগে আর্যরা মধ্য এশিয়া থেকে সেই থেকে এই স্থানে এসে বসবাস করেন। অষ্টম শতাব্দীতে রাজা ললিতাদিত্য এই স্থানে রাজত্ব করেন। তিনি মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারতের বহুস্থান জয় করেন।

"সম্রাট অশোকের রাজত্বকালীন কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কণিষ্কের রাজত্বকালীন এই স্থানে বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর মোগল অধিকারভুক্ত হয়। মোগল সাম্রাজ্যের বহু নিদর্শন এখন পর্যন্ত কাশ্মীরে অম্লান অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়।

"জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য কাশ্মীরীদের হিন্দুধর্মে পুনঃ দীক্ষিত করবার জন্য এই স্থানে এলে স্থানীয় ব্রাহ্মণদের অতিরিক্ত গোঁড়ামির জন্য তা ব্যাহত হয়।

"শিখ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরণজিৎ সিংহ তাঁর সেনাপতি ডোগরা রাজপুত গোলাব সিংহ-এর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে রাজা উপাধির সহিত কাশ্মীর ও জম্বু রাজ্য দান করেন। কিন্তু শিখদের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ আরম্ভ হলে দূরদর্শী গোলাব সিং প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করে ইংরাজদের সাহায্য দিয়ে প্রীতিভাজন হন। ফলে ইংরাজেরা দু'কোটি টাকার বিনিময়ে সমগ্র জম্বু কাশ্মীর উপত্যকা গোলাব সিংকে ছেড়ে দেন।"

"গোলাব সিং-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপ সিং পরম ধার্মিক ও প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। কিন্তু তিনি অপুত্রক থাকায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হরি সিংকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে সুশিক্ষিত করে আনেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে রাজা প্রতাপ সিং তাঁর মন্ত্রী ও পারিষদবর্গকে সম্মুখে আহ্বান করে হরি সিংহকে তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন।

"রাজা হরি সিং প্রথম জীবনে অতি বিচক্ষণতার সহিত রাজকার্য পরিচালনা করে সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি মিঃ কাক-কে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করে মারাত্মক ভুল করেন। মিঃ কাক নিম্নপদ থেকে চতুরতার সহিত ধাপে ধাপে উন্নত হয়ে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করেন।

"এই সময় ভারত বরেণ্য নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কাশ্মীরে প্রবেশ করলে মিঃ কাকের আদেশে বন্দী হন। ভারতের জনসমুদ্র সেজন্য বিক্ষুব্ধ হয়।

"ভারতে বিদেশী শাসন ছিন্ন হয়ে যাবার পর পাকিস্তান পরোক্ষে উপজাতির দ্বারা কাশ্মীর আক্রমণ করলে সমস্যা দেখা দেয়। পাকিস্থানের সহায়তায় হানাদাররা এক সঙ্গে লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও নিশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়ে কয়েকদিনের জন্য কাশ্মীরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।

"জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যায় পাকিস্থানের বীভৎস কাণ্ড দর্শনে। জনমত ও বিশিষ্ট নেতৃবর্গের চাপে পড়ে রাজা হরি সিং অনন্যোপায় হয়ে ভারতের সাহায্য প্রার্থী হন। তিনি ২৫।১০.৪৭ তারিখে ভারত সরকারের নিকট কাশ্মীরের ৪০ লক্ষ নরনারীর জীবন রক্ষার জন্য আকুল প্রার্থনা করেন ও নিয়মতান্ত্রিক ভাবে ভারতে যোগ দেন।

"এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। মাত্র কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় ভারত একাঙ্ক নাটকের যবনিকা পাত ঘটিয়ে তার গৌরবময় নব অধ্যায় সুচনা করল।

"পাঞ্জাবী বীর কর্ণেল রণজিৎ রায় দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে নগণ্য সৈন্য দ্বারা হানাদারদের গতিরোধ করে দাঁড়ালেন। লক্ষ লক্ষ নরনারী সহ শ্রীনগর রক্ষা পেল কিন্তু ২৭।১০।৪৭ সালে ভারত হারাল তার ৩৪ বৎসর বয়স্ক বীর সন্তানকে চিরতরে। বারমূলায় পথের ধারে কর্ণেল রায়ের স্মৃতিস্তম্ভ দেখে আমরা শহীদের প্রতি সম্মান জানিয়েছি।

"এই সঙ্গে মনে পড়ে ব্রিগেডিয়ার ওসমানের স্মৃতি। নৌশেরা ও ঝানগড় পুনঃ অধিকার করার পর রাত্রে অতর্কিতে শত্রুর বোমার আঘাতে মরলোক ত্যাগ করেন। সে সংবাদ পেশোয়ারে পৌঁছান মাত্র উৎসব সুরু হয়। পাকিস্থানে আনন্দের বন্যা বয়ে যায় দিকে দিকে।

"শহীদের মৃতদেহ দিল্লীতে আনীত হয়ে সমাধিস্থ করা হয় পূর্ণ সামরিক মর্যাদায়। লক্ষ লক্ষ নরনারীর সঙ্গে সেনানায়করা ও মন্ত্রীবৃন্দ সকলে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শবানুগমন করেন অশ্রুপূর্ণ লোচনে।

"ভারতে হিন্দু-মুসলমান নাগরিকরা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। রাজধানীর চারিদিকে নেমে আসে বিষাদের ছায়া।"

পড়া শেষ হয়ে গেল। স্বপ্না মিঃ ঘোষের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে খাতাখানি রূপেনের হাতে দিল। মিঃ ঘোষ বললেন, "সুন্দর লেখা হয়েছে। স্বল্প কথায় খুঁটিনাটি তথ্যে ভরা সৌন্দর্যময়ী কাশ্মীরের এ এক রমনীয় রচনা। লেখার চর্চা রাখলে মিঃ মুখার্জী একদিন সাহিত্যিক মহলে সুনাম অর্জন করবেন।"

আমি বললাম, "রাত হয়েছে, চলুন খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়া যাক। কাল ভোরেই তো আবার রওনা হতে হবে।"

মিঃ দাস বললেন, "পাঠানকোটে পৌঁছে আপনারা তবু বিশ্রামের কিছুটা সময় পাবেন, আমাকে কিন্তু বাস থেকে নেমেই ট্রেনে উঠতে হবে।"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

আমরা খাবার জন্যে সকলে নীচে চললাম।

পাঠানকোটে এসে মিঃ দাসকে গাড়িতে উঠিয়ে দিলাম। ট্রেন ছাড়বার সময় মিসেস দাস বললেন, "মিঃ চ্যাটার্জিকে আমি তাঁর কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমাদের সঙ্গে প্রথম দেখা হলে আপনি বলেছিলেন অফিস ফেরৎ প্রতিদিন আমার বাড়িতে চা খেয়ে বাড়ি ফিরবেন।"

উত্তরে বললাম, "আপনারা কলকাতায় ফিরলে নিশ্চয় যাব মিসেস দাস।"

ট্রেন ছেড়ে চণ্ডীগড়ের দিকে এগিয়ে চলল। আমার ট্রেন ছাড়ার বিলম্ব দেখে বিশ্রামাগারের সামনে বসে গল্প সুরু করলাম।

স্বপ্না বলল, "হ্যাঁ দাদা পাঠানকোটে বোধহয় বেশির ভাগই মুসলমান অধিবাসী?"

"কেন বলতো?"

"নাম শুনে তাই বলেই তো মনে হয়।"

"এখানে আসবার আগে আমার ধারণা তোমার মতই ছিল। কিন্তু এখন সে ভুল ভেঙেছে। এখানে একজনও মুসলমান নেই।"

"হায় ভগবান—তাই নাকি?"

রূপেন বলল, "পাঠানকোট পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার একটি মহকুমা। লোক সংখ্যা আশি হাজার, সকলেই কিন্তু হিন্দু।"

পাশ থেকে কানে এল, "আরে ছোড় দেও ভাইয়া—কৈ বাঙ্গালী

মাই দো রোজসে ছুঁয়া রোতে হ্যায়, জরুর কুছ লোকসান হো গিয়া।"

তাকিয়ে দেখি দূরে একটি জটলা।

স্বপ্না বলল, "চলুন দাদা একবার দেখে আসি।"

রূপেন বলল, "ও সব ঝামেলার মধ্যে না যাওয়াই ভাল।"

স্বপ্না ম্লান হেসে বলল, "শুনলে না বাঙ্গালী যে, ঝামেলা মনে করলে কি চলে?"

আমি বললাম, "চল তবে দেখে আসি।" ভিড়ের মধ্যে একবার উঁকি দিয়েই স্বপ্না বলল, "কি সর্বনাশ—এ যে পিসিমা।"

ভিড় ঠেলে কোন রকমে সে ঢুকে পড়ল। আমরা ভিড়ের মধ্যে এসে দেখি স্বপ্না পিসিমার পাশে বসে পড়েছে আর বুড়ি স্বপ্নাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।

"আমি কেমন করে এ মুখ দেখাব মা? অলকা মুখে কালি দিয়ে শিবতোষের সঙ্গে চলে গেছে।"

স্বপ্না বলল, "আপনার কি দোষ পিসিমা, যে চলে গেছে সেই কালামুখী। শিবতোষকে তো সেদিন ভাল ছেলে বলেছিলেন।"

"ভাল বলেই তো জানতাম মা—কিন্তু ভিতরে যে এমন কালকূট—বিষে ভরা তা জানব কেমন করে। এখন আমি এ মুখ নিয়ে কেমন করে দেশে ফিরব মা!"

"আমার পিসিমাকে আমি আমার কাছে কলকাতার বাড়িতে রেখে দেব, দেশে যেতে দেব না।"

স্বপ্না অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পিসিমাকে এনে ওয়েটিং রুমে বসাল। তারপর সে বাইরে এসে আমাদের বলল, "এ অঘটন যে একদিন ঘটবে এ আমি বহু পূর্বেই অনুমান করেছিলাম।"

রূপেন বলল, "তুমি কেমন ক'রে অনুমান করবে? শুনলে না পিসিমা-ই কিছু বুঝতে পারেন নি।"

"সত্যি বলছি—বিশ্বাস কর আমার কথা।"

"জানতে যদি পেরেছিলে তবে আমাদের বল নি কেন? আমরা পিসিমাকে বলে সাবধান করে দিতাম।"

"দেখ এ কথা কি কাউকে বলা যায়? মেয়েমানুষের চরিত্র সম্বন্ধে একটা কথা রটলে বেঁচে থাকাই তার বিড়ম্বনা যে।"

"তবে এখন সে কথা বলছ কেন?"

"এখন আর ঢাকাঢাকির কোন প্রয়োজন নেই। সেই সকলকে জানান দিয়ে সরে পড়েছে।"

"তাহলে এখন বল ঘটনাটা কেমন করে তুমি টের পেয়েছিলে।"

'শোন বলি—কুদে ডাকবাংলোতে সে রাত্রে আমার শোবার কোন পৃথক জায়গা ছিল না, বাধ্য হয়ে আমি পিসিমার কথায় অলকার কাছে শুয়ে পড়ি।

"একে অচেনা জায়গা—তাতে ভিন্ন পরিবেশ। বিশেষ করে অনাত্মীয়া কারুর কাছে ঐ ভাবে এক বিছানায় শোয়া সেই আমার জীবনে প্রথম।

"সমস্তদিনের ক্লান্তির পরও ঘুম এল না, চুপচাপ শুয়ে তোমাদের কথাই ভাবতে লাগলাম। সকলে ঘুমিয়ে পড়লে অলকা নিঃশব্দে উঠে বাতি না জ্বালিয়ে বাইরে গেল।

"সে বাথরুমে গেছে ভেবে আমিও উঠে বাইরে গেলাম। বাইরে অবশ্য আলো জ্বলছিল। আমি সামনে তাকাতেই দেখলাম অলকা শিবতোষের সঙ্গে খুব বিশ্রী ভাবে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।"

রূপেন বলল, "তারপর?"

"আমার বাথরুমে যাওয়া মাথায় উঠল, আমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসে নিজের জায়গায় আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে অলকা ফিরে এসে শুয়ে পড়ল।

"আমি মনে করলাম অলকা আমাকে দেখতে পায় নি। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি তার খেয়াল নেই, কিন্তু ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথেই আমার সে ভুল ভেঙ্গে গেল, সে আমায় টের পেয়েছিল।"

রূপেন বলল, "এখন বুঝতে পারছি, কুদে পিসিমাকে দিয়ে তোমার উপর ঝাল ঝাড়ার কারণটা।"

"দেখ এজন্য অলকাকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না। অল্প বয়সে সে বিধবা হয়েছে। স্বামী কাকে বলে জানে না, তার উপর বাড়িতে বাপ ভাই বা এমন একটা কোন পুরুষ মানুষ নেই। চিরকাল পিসির কঠোর শাসনে থাকার পর হঠাৎ বাঁধন আল্গা হলে যা হবার তাই হয়েছে। তাছাড়া দেখতে শুনতে তো সে ভালই—বয়সের ধর্ম আর যাবে কোথায় বল।"

আমি বললাম, "তোমরা বস, আমার সময় হয়ে এল, আমি সকলের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।"

বিশ্রামাগারের ভিতরে এসে প্রথম মিঃ ঘোষকে হাত তুলে বিদায় অভিনন্দন জানালাম। মিঃ ঘোষও হাসি মুখে হাত তুললেন।

ঝর্ণা এক টুকরো হাসি মুখে নিয়ে বলল, "কাকাবাবু সামনে কালীপূজার ছুটিতে কিন্তু আমাদের বাড়িতে আসা চাই।"

বললাম, "গেলে কি খাওয়াবে বল ?"

"ঢেঁকি ছাঁটা দাদ্‌খানি চালের ভাত, মুগ, মুশুর ও ছোলার ডাল, আলু, কপি, বেগুন ও টম্যাটোর তরকারী। সবগুলি টাটকা ও নিজেদের ক্ষেতের। আর পুকুরে প্রচুর মাছ থাকলেও আপনার তো তা চলবে না, তার বদলে ঘরের গরুর প্রচুর দুধ ও বাড়ির তৈরী মিষ্টি।"

হেসে বললাম, "সবগুলিই 'এ' থেকে 'জেড্' পর্যন্ত ভিটামিনে ভর্তি, কি বল ?"

সকলেই এবার হো-হো করে হেসে উঠলেন।

মৃণালবাবুকে বললাম, "আপনার বাড়ি থেকে সোজা পশ্চিম দিকে হেঁটে গেলেই চৌরাস্তার উপর আমাদের বাড়ি পাবেন।"

"কিছু বলতে হবে না দাদা, আপনি বাড়ি ফেরার এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি আপনার ওখানে গিয়ে ঢুঁ মারবো।"

বৌদির কাছে এলে শুভ্রা বলল, "যাবেন কিন্তু আমাদের বাড়িতে। কথা দিয়েছেন যেন মনে থাকে। আর কলকাতায় পৌঁছে আমাদের বাড়ির ঠিকানায় পত্র দিয়ে জানাবেন ফটোগুলির কি ব্যবস্থা করেছেন।"

বললাম, "নিশ্চয়ই জানাব।"

বৌদি হাসিমুখে বললেন, "আর কয়েকটা দিন ছুটি থাকলে জ্বালামুখী অমৃতসর হয়ে সকলে মিলে একসঙ্গে কলকাতায় ফেরা যেত। এতদিন একসঙ্গে থেকে ঠিক যেন বাড়ির লোকের মত হয়ে গেছি সকলে। আমাদের বাড়িতে গেলে সত্যই খুব খুশী হব। কত-ক্ষণেরই বা পথ। হাওড়া থেকে খড়্গপুর এমন কিছু দূর নয়। চিঠি দিয়ে জানালে কাউকে না কাউকে ষ্টেশনে পাঠিয়ে দেব।"

"আর বলতে হবে না বৌদি, নিশ্চয়ই যাব। শশীবাবু কোথায়।"

"ঠাকুরপো মনে হয় হোটেলের দিকে গেছেন, ফিরে এলে বলব।"

অমুর পিঠে হাত দিয়ে বললাম, "তুমি কলকাতায় গেলে সটান আমার কাছে চলে যাবে। কোন রকম কিন্তু করো না।"

আমি বাইরে এসে রূপেন ও স্বপ্নার সঙ্গে ট্রেনের দিকে চলতে সুরু করলাম।

গাড়ি ছাড়বার আগে স্বপ্না বলল, "দাদা মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন, পিসিমাকে নিয়ে জড়িয়ে না পড়লে জ্বালামুখী যাওয়া মাথায় রেখে আপনার সঙ্গে রওনা হতাম। বাবুলের জন্য আজ কদিন থেকে মন বড় অস্থির হয়েছে।"

রূপেন বলল, "স্বপ্না তুমি জ্বালামুখীর প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে দাদার সঙ্গে ফিরে চল। আমি বেডিং স্যুটকেশ নিয়ে আসি।"

স্বপ্না ম্লানমুখে বলল, "সে হয় না, আমি বুড়ো মানুষকে কথা দিয়েছি। জ্বালামুখী আমাদের যেতেই হবে।"

কিছুক্ষণ পর স্বপ্না ধরা গলায় বলল, "দাদা এতদিন একসঙ্গে থেকে তিলতিল করে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছি সেটা যেন জোর করে নিজের হাতে ভেঙ্গে দেবেন না, কলকাতায় ফিরলে দেখা করবেন।"

কোন রকমে প্রণাম করে তাড়াতাড়ি সে ট্রেন থেকে নেমে গেল। রূপেনও প্রণাম করে ম্লান মুখে নেমে পড়ল।

হুইসিল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। স্বপ্নার চোখ রুমাল দিয়ে ঢাকা, তার সঙ্গে আর চোখাচোখি হল না। রূপেন হাত নাড়াতে লাগল। দেখি অমু প্লাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে ট্রেনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। আমি তাকে দেখিয়ে হাত নাড়লাম, সে চুপচাপ চেয়ে রইল। ট্রেন গন্তব্য পথে দ্রুত এগিয়ে চলল।

ট্রেন চলেছে।

কাশ্মীরের উৎসবে ভরা দিনগুলি একে একে আমার স্মৃতিপথে উঁকি দিতে লাগল।

সঙ্গী-সাথীদের হাসি কৌতুকে গাঁথা গল্প ও টুকিটাকি ঘটনাগুলি এক সঙ্গে ভিড় করে এসে মনকে বিষাদে ম্রিয়মান করে ফেলল।

মনে হচ্ছে আমি হঠাৎ উল্কার মত গ্রহচ্যুত হয়ে স্রোতের মুখে পড়ে অকূলে ভেসে চলেছি।